

ଚମକ ରାମାନ



# ଅଭ୍ୟାସ

୫



# টুকু জাতিয়া



টেনশন টিনা, যে তুচ্ছ কারণে দুশ্চিন্তা করতে করতে হতাশায় ডুবে যায়  
 বিটলা বান্তি, দুষ্টমির আড়ালে যার প্রশংগলো চিন্তার খোরাক জোগায়  
 তুখোড় তৰী, যে পারদশী নানামুখী দক্ষতায়  
 আৱ অবাক পৃথী, জগতেৰ সবকিছুতে যে বিশ্বয় খুঁজে পায়  
 —ওৱা সবাই আজ অসহায় নজিৰুল্লাহ মাস্টারেৰ দাপটে।  
 ওদেৱ মনে গণিত নিয়ে হাজারো প্ৰশ্ন, উত্তৰ মেলে না কিছুতেই!

ওৱা তখন আশ্রয় খৌজে অঙ্ক ভাইয়াৰ কাছে।

কোথেকে এল, কোথায় কাজে লাগে, এটা এমন কেন, অমন নয়  
 কেন, এটা শিখে কী হয়, ওটাৱ মূল ঘটনাটা কী— এমন সব  
 প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ ‘অঙ্ক ভাইয়া’ দিয়ে যান পৰম মমতায়।

বাংলাদেশেৰ আয়তন নাকি ক্ষেত্ৰফল, পেঁয়াজ কুচি পদ্ধতিতে  
 গোলকেৱ আয়তন, পিথাগোৱাস দিয়ে আইনষ্টাইন, ফাংশনেৰ  
 বৃত্তান্ত, পৃথিবীৰ সুন্দৰতম সমীকৰণ, ঝণাঝুক সংখ্যাৰ  
 লসান্ত-গসান্ত, গিটারেৰ গণিত, হাতে-কলমে ঘনমূল, সাইন  
 কসেৱ নামৱহস্য, লগেৱ ভেতৱেৱ কথা, অসমতাৱ চিহ্ন— এমন  
 চিন্তাগুলো যদি আপনাৱ মনে কৌতুহল জাগায়— বইটি আপনাৱ  
 জন্য!

অঙ্ক ভাইয়া

চমক হাসান





প্রকাশক : আদর্শ

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : আদর্শ বই  
কনকড' অ্যাম্পেরিয়াম, কাঁটাবন, ঢাকা ১২০৫

(+০২-৯৬১২৮৭৭, ০১৭১০৭৭৯০৫০

Email: [info@adarshapublications.com](mailto:info@adarshapublications.com)

Website: [www.adarshapublications.com](http://www.adarshapublications.com)

### অঙ্ক ভাইয়া

২য় সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ : ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫, ২৫ নভেম্বর ২০১৮

২য় সংস্করণ : ২০ আষাঢ় ১৪২৫, ৪ জুলাই ২০১৮

১ম প্রকাশ : ১৯ মাঘ ১৪২৪, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

### © লেখক

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত; লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটি  
আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ

প্রচ্ছদ : সাজু

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা : আদর্শ প্রিন্টার্স

প্রধান পরিবেশক : আদর্শ বই

মূল্য : বাংলাদেশে ৩০০ টাকা

*Anko Bhaiya (Published in Bengali)*

by Chamok Hasan

Published by Adarsha

Concord Emporium, Kataban, Dhaka 1205

ISBN: 978-984-9266-42-6

## উৎসর্গ

আমার কন্যা 'বিনীতা বর্ণমালা'কে।

মা, চোখভর্তি প্রশ্ন নিয়ে সহজ একজন মানুষ হয়ে বড় হ। উত্তর পাওয়ার  
আগ পর্যন্ত নষ্ট হতে দিবি না একটা প্রশ্নকেও। আর যদি উত্তর পেয়ে যাস,  
খুঁজে বের করবি আরও আরও প্রশ্ন। প্রশ্নই পথ দেখাবে ভবিষ্যতের! আর  
যখন ভবিষ্যতের পথে হাঁটবি, মনে রাখিস— মেধা, প্রতিভা, কর্মদক্ষতার  
থেকেও বহু দামি হলো অন্যের জন্য মমতা, অন্যের থেকে পাওয়া  
ভালোবাসা। স্বার্থহীন চেষ্টায় অর্জন করে নিস সেই ভালোবাসা।  
বাবার দোয়া রইবে সব সময়!

এবং আমার কন্যার মা 'ফিরোজা বহি'কে...

তোমায় প্রিয় সংখ্যা ৫। একদিন কথায় কথায় আমায় বলেছিলে,  
'আমি ৫ আর তুমি হচ্ছ ২৫।' আমি জানতে চাইলাম, 'কেন, আমি ২৫  
কেন?'। তুমি বলেছিলে, 'তুমি আমার বর-গো'! এর চেয়ে প্রেমময়, এর  
চেয়ে মন খুশি করা গাণিতিক উক্তি আমি আর কোনো দিন শুনিনি!

আমার মেয়েটা তোমার মতো হোক, যেখানেই যাক  
তার চারপাশটা ভরিয়ে রাখুক আনন্দে।  
পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাণচক্ষুল মানুষ হওয়ার দীক্ষা  
ও যেন তোমার থেকে পায়।

## ভূমিকা

আমি মনে করি, গণিতের নানা অনুশীলনী আর সমস্যা সমাধানের কৌশল শেখানোর পাশাপাশি একজন গণিতশিক্ষকের একটা বিরাট দায়িত্ব হলো ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং তাদের কৌতুহলকে জাগ্রত রাখা। কেউ যদি নিজের মতো করে গণিত সমাধান করতে চায়, সেটাকে নিবৃত্ত না করে বরং উৎসাহ দেওয়া। এই কাজগুলো অনেকেই করেন না। এইটা জেনে কী হবে, তুই কি বেশি বুঝিস, আগের ক্লাসের ওইটা পারিস যে এইটা জানতে চাস, সাহস কত যে উপপাদ্য নিজের ভাষায় লিখিস, আমি যেভাবে অঙ্ক করিয়েছি ওইভাবেই করবি, এমন অযৌক্তিক বাক্যগুলো এখনো শোনা যায় প্রায়ই। এতে গণিত হয়ে ওঠে দুর্বোধ্য আর ভীতিকর। অথচ গণিত কী অপার আনন্দের একটা বিষয়! কত দারুণ সব চিন্তা আছে এর নানান শাখায়।

আমি জানি, গণিত নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অনেক প্রশ্ন। ‘কেন এমন হয়’, ‘কেন অমন হলো না’, ‘এটা কোথেকে এল’, ‘ওটা জেনে লাভ কী’—এমন দারুণ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে নিজেরই জানা হয়ে যায় অনেক কিছু। কিছু প্রশ্ন তো রীতিমতো চ্যালেঞ্জিংও। এই প্রশ্নগুলো যখন আমরা মেরে ফেলি, আমরা হয়তো ধ্বংস করে দিই ভবিষ্যতের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদকে। ভবিষ্যতের যে হতে পারত বিজ্ঞানের মহিরূহ, তার বীজ হয়তো আমরা শেষ করে দিচ্ছি অঙ্কুরেই। এটা অন্যায়। ছোট্ট একটা প্রশ্ন কিংবা আপাততুচ্ছ একটা ভাবনাকেও হারিয়ে যেতে দিতে নেই। কারণ সেখান থেকেই একসময় জন্মাতে পারে গণিতের গভীর বিষয়গুলোর প্রতি আগ্রহ, ভালোবাসা।

গণিত নিয়ে ইত্রিহাসীদের প্রশ্নগুলো কেমন— এসা জনতে চেয়েছিলাম  
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (www.facebook.com/chamok.  
hasan) আমার বক্তৃ, ভক্ত, শুভানুধ্যায়ীদের কাছে। সেখানে চমৎকার  
সব প্রশ্ন এসেছে। চেষ্টা করেছি সাধ্যমতো অনেকগুলোর উত্তর দিতে।  
সেই উত্তরগুলোকে সংকলন করে রাখার অভিপ্রায় থেকে এই বইয়ের  
শুরু। যাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, তাদের নাম এই বইয়ের শেষে  
কৃতজ্ঞতায় উল্লেখ করেছি। আরও বহু মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা  
স্বীকার করছি। আমার সহমানুষ বহিই নাম দিয়েছে অনেকগুলো  
চরিত্রের, তাদের চরিত্র কেমন হবে সেটার বেশ কিছু ধারণা ওর দেওয়া।  
ধন্যবাদ জানাই ৰাঙ্কার মাহবুব ভাইয়াকে, তার নিঃস্বার্থ সহযোগিতার  
জন্য। দ্রুত প্রচ্ছদ করে দিয়েছেন গুণী শিল্পী সাজু ভাই, কৃতজ্ঞতা  
তাকেও। গণিত অলিম্পিয়াডে কাজ করার সময় যারা সহকর্মী এবং  
নির্দেশক ছিলেন তাদের কথা আমার লেখা সমস্ত গণিত বইয়ে স্মরণ  
করব। শ্রদ্ধেয় মুনির হাসান, মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যার, মোহাম্মদ  
কায়কোবাদ স্যার, সুব্রত দেবনাথ, অভীক রায়, সৌমিত্র চক্ৰবৰ্তী,  
তামিম শাহরিয়ার সুবীন ভাই, মাহমুদুল হাসান সোহাগ ভাই— এদের  
প্রত্যেকের থেকে আমি অনেক শিখেছি। গণিতের ভালোবাসাকে সারা  
বাংলায় ছড়িয়ে দিতে ওনাদের অবদান অনেক, ওনাদের সান্নিধ্য পেয়ে  
নিজেকে ধন্য মনে করি। ধন্যবাদ আদর্শকে খুব অল্প সময়ের মোটিশে  
বইটা প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য। সময়ের সঙ্কীর্ণতায় অনেক ভুলভাস্তি  
রয়ে যেতে পারে বইয়ে। সাধ্যমতো চেষ্টা করব পরবর্তী মুদ্রণে ঠিক  
করে নেওয়ার জন্য।

এই বইটা পড়া যাবে দুইভাবে। একটা ধারাবাহিক গল্প বলা হয়েছে  
কয়েকটা চরিত্রের বর্ণনায়— স্কুলের এক কঠিন মাস্টার, সেই স্কুলে পড়া  
চারজন শিক্ষার্থী আর বুয়েটপড়ুয়া একটা ছেলে যার গণিতের প্রতি  
অসীম ভালোবাসা। গল্প আকারে না পড়ে কেউ যদি সরাসরি প্রশ্নের  
উত্তর আকারে পড়তে চায়, সেটাও সম্ভব। তার জন্য বইয়ের শেষে পৃষ্ঠা  
নম্বরসহ একটা বিষয়-তালিকা দেওয়া আছে। কেউ চাইলে সেটা দেখে  
প্রশ্নের উত্তর আকারেও পড়তে পারবে।

সবশেষে ক্ষমাপ্রার্থনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন! এই বইয়ে একজন গণিতশিক্ষককে উপস্থাপন করা হয়েছে নিষ্ঠুরভাবে, যিনি বাচ্চাদের ভয় দেখান, উত্তর দেন না কোনো প্রশ্নের। গল্লের খাতিরে চরিত্রটাকে অতিরঞ্জন করা হয়েছে কিছুটা। আমি জানি এমন শিক্ষক বিরল নন। কিন্তু আমি স্পষ্ট করেই বলতে চাই, গণিত অলিম্পিয়াডে কাজ করার সুবাদে এমন অনেক শিক্ষক আমি দেখেছি, যারা শ্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে গেছেন নিজের সবটুকু সাধ্য নিয়ে। আমি দেখেছি, কী করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষকেরা নিজ নিজ স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে আয়োজন করছেন গণিত অলিম্পিয়াড। আমি দেখেছি, স্কুলের সময়ের বাইরে নিজের সময় বিলিয়ে শিক্ষকেরা তৈরি করছেন শেখানোর নানান বিষয়বস্তু। আমি সান্নিধ্য পেয়েছি এমন সব শিক্ষকের, যারা তাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিজের জীবনের সব সুখ-আহুদ উপেক্ষা করেছেন অবলীলায়। সেই বীরদের জন্য, সেই কারিগরদের জন্য আমার অকৃষ্ণ শ্রদ্ধা। আপনারা এই বইয়ের নজিবুল্লাহ মাস্টার নন।

### চমক হাসান

ভ্যালেন্সিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

## সূচি

ভূমিকা	৯
ভয়ের ভাবনাই ভয়ংকর	১৩
প্রশ্ন চলুক নির্ভর্যে	২১
সংখ্যা নিয়ে সংশয়	৩২
বীজগণিতের বিচ্ছ্রিত চিন্তা	৫৭
ফাংশন নিয়ে টেনশন	৭৭
জ্যামিতির জমজমাট জল্লনা	৯৫
সুরের মায়ায় বাঁধা যথন গণিত	১১৫
ত্রিকোণমিতির কিছু কথা	১২৬
মুখোমুখি অঙ্ক ভাইয়া আর নজিবুল্লাহ মাস্টার	১৩৬
 পরিশিষ্ট ১	১৪৩
বিষয়-তালিকা	১৫৩

## ভয়ের ভাবনাই ভয়ংকর

**১.১**

ছায়ামূর্তির মতো হেঁটে আসছিলেন মানুষটি, ধীরে ধীরে, তিনতলার করিডর ধরে। হাতে দুটো বই, একটা চকের বাক্স, একটা ডাস্টার, আর কালো রঙের একটা পাকানো বেত। একেকটা ফ্লাসরঞ্জের সামনে দিয়ে হেঁটে আসেন আর ফ্লাসরঞ্জগুলোর স্বাভাবিক হইচই হঠাতে থেমে যায়, কবরস্থানের মতো সুনসান নীরব হয়ে যায়। মাঝে মাঝে দুয়েকজন ছাত্রের ভয় পাওয়া গলার ফিসফিস আওয়াজ শোনা যায়, ‘চুপ থাক সবাই, নজিবুল্লাহ স্যার যায়।’ শুনে নজিবুল্লাহ সাহেবের চেহারায় কোনো ভাবান্তর হয় না, তিনি নীরবে হেঁটে যান! হেঁটে হেঁটে করিডরের শেষ মাথায় দশম শ্রেণি ‘খ’ শাখার ফ্লাসে গিয়ে ঢোকেন। তুকেই দরজাটা ঠাস করে বন্ধ করে দেন। টেবিলে বই, চক-ডাস্টার রাখেন, তারপর বেতটা হাতে নিয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। ফ্লাসের দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকান। মেয়েরা বসেছে বাম দিকের বেঞ্চগুলোতে, ছেলেরা ডান দিকে।

সবাই জানে, আজ কোনো একটা মেয়ের কপালে দুঃখ আছে। স্যার সবার সম-অধিকারে বিশ্বাসী। গতকাল স্যারের প্রচণ্ড ঝাড়ি খেয়ে প্রায় সংজ্ঞা হারিয়েছিল একটা ছেলে। ছেলেটার বিশেষ দোষ ছিল না। স্যার পড়াছিলেন পিথাগোরাসের উপপাদ্য। সে মুখ ফসকে জিজেস করে ফেলেছিল, স্যার, এটা কোথায় কাজে লাগে। আর যায় কোথায়— সে নিজেকে কী মনে করে, কোন সাহসে সে পড়ালেখা বাদ দিয়ে অদরকারি

প্রশ্ন করে, সে আগের ক্লাসের কিছু বোঝে কি না, এসব বলার পর আরও স্পষ্ট করে স্যার তাকে বুঝিয়ে দিলেন, ছাত্রদের কাজ প্রশ্ন করানা, প্রশ্ন করবে স্যারেরা, আর ছাত্ররা লিখবে উত্তর!

সে যা-ই হোক, গতকাল যেহেতু একটা ছেলেকে ঝাড়ি দিয়েছেন, সবাই প্রায় নিশ্চিত যে আজকে ঝাড়ি দেবেন কোনো একটা মেয়েকে। স্যারের নীতি এবং সমতাবোধে কোনো ভুল নাই। নজিবুল্লাহ স্যার মেয়েদের সবার দিকে একবার নজর বুলিয়ে লটারির মতো করে একজনকে বেছে নিলেন, ঠান্ডা-গন্তীর গলায় হাঁক দিলেন, ‘অ্যাই, তুই দাঁড়া।’ যাকে বললেন, সে দাঁড়াল না। তার পেছনের দুই সারির দুজন ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কিঞ্চিত বিরক্ত হয়ে স্যার বললেন, ‘তোরা বস, এই যে লাল ব্যাগ, তুই দাঁড়া। কী হলো, কথা কানে যায় না?’ টিনা আশপাশে তাকিয়ে দেখে শুধু তার ব্যাগটাই লাল। তার আশঙ্কাই সত্যি, আজ তার পালা। ‘আর যদি জীবনে লাল ব্যাগ কিনেছি!’ ভাবতে ভাবতে আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে উঠে দাঁড়াল...।

## ১.২

টিনা যখন জর্জরিত নজিবুল্লাহ স্যারের প্রশ্নবাণে— মনে করতে পারছে না ছোট ক্লাসের জিনিসপত্রও; টিনা যখন ভেঙে পড়ছে স্যারের অকথ্য তিরক্ষারে, প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন ভুলে নিজেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে আদর্শ একজন কাজের বুয়া হিসেবে; টিনা যখন ফরিয়াদ করছে, ‘ও আল্লাহ গো, তুমি এই পৃথিবীতে অক্ষের মতো ভয়াবহ ব্যাপারটা কেন দিলা, কী দরকার ছিল, আর দিলা তো দিলা নজিবুল্লাহ স্যারকেই দিলা, কেন আল্লাহ, হোয়াই...’ ঠিক তখন, ২ কিলোমিটার দূরে— গণিতের প্রেমে মুক্ত হয়ে উদাস ভঙ্গিতে হাঁটছিল ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের হ্যাঙ্লা-পাতলা একটা ছেলে।

সূর্য প্রায় মাথার ওপর, ছেলেটার ছোট একটা ছায়া পড়ছে মাটিতে। সেই প্রায়-দেখাই-যায়-না-এমন ছায়ার দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল, গণিত আমাদের কী অবিশ্বাস্য সব ক্ষমতা দিয়েছে। সূর্য মাথার ওপর থাকলে ঠিকভাবে ছায়া পড়ে না, শুধু এইটুকু ব্যাপারের ওপর ভিত্তি করে এখন থেকে আড়াই বছর আগে গোটা পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় নিখুঁতভাবে

মেপে ফেলেছিলেন ইরাচোস্ট্রনিস।

ছেলেটা আকাশের দিকে তাকায়, দেখে একটু করে মেঘ জড় হচ্ছে।  
রাতে বৃষ্টি হবে— এটাই আবহাওয়ার পূর্বাভাস। পূর্বাভাসে বলে দেওয়া  
আছে রাত ১২টায় শতকরা ৮০ ভাগ সম্ভাবনা আছে বৃষ্টি হওয়ার!  
তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, চাপ, বাতাসের গতিবেগ, গতিপথ মেপে গণিত  
জানিয়ে দিচ্ছে কখন বৃষ্টি হবে! কী দারুণ। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে এসব  
পরিমাপের যন্ত্রপাতি যত নিখুঁত হচ্ছে, কম্পিউটারের হিসাবক্ষমতা যত  
বাড়ছে, যত বেশি তথ্য বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে, তত বেশি নিখুঁত হয়ে  
উঠছে এই মডেলগুলো।

ছেলেটা রাস্তার দিকে তাকায়, পিচের রাস্তাটায় কী কী জিনিস কী  
অনুপাতে থাকবে, তার নিখুঁত হিসাব আছে। কী ওজনের গাড়ি  
কতগুলো চললে কত বছর রাস্তা ভালো থাকবে তার হিসাব আছে। সে  
যানবাহনগুলোর দিকে তাকায়, ছোট ছোট যন্ত্রগুলো কীভাবে বসালে,  
গাড়ি কীভাবে চলবে তার জটিল গণিত আছে।

হাতের মোবাইল ফোনটার দিকে তাকায় সে, ছোটখাটো একটা  
কম্পিউটার এটা। সারা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করছে এইটুকু যন্ত্র।  
এখানে বসে সে জেনে ফেলতে পারে, পৃথিবীর আরেক কোনায় কী  
ঘটছে এই মুহূর্তে। এর পেছনে সবচেয়ে বড় শক্তিগুলোর একটি হলো  
গণিত। ও ভাবে আর মুক্ষ হয়।

গাণিতিক ধারণাগুলো ব্যবহার করে মানুষ কত সহজে আপাত-অসাধ্য  
সব কাজ করে ফেলছে! ছেলেটা, যার নাম তৃৰ্য, অস্ত্রির হয়ে ভাবে, ইশ্ৰ,  
যদি সবাইকে বোঝাতে পারতাম, গণিতের ধারণাগুলো কী অসাধারণ  
রকম সুন্দর!

শুধু কী কাজে লাগে বলেই গণিত সুন্দর?

তৃৰ্য জানে, বিষয়টা মোটেই অমন না।  
বিশুদ্ধ গণিতের অনেক শাখা আছে,  
যেগুলো কোনো ‘কাজে’ লাগানোর জন্য  
তৈরি হয়নি। সেগুলো যেন শিল্পের

শুধু কী কাজে লাগে বলেই  
গণিত সুন্দর?

খাতিরে শিল্পের মতো। তার পরতে পরতে আছে বিমৃত্ত সৌন্দর্য। তার একেকটা তত্ত্ব যেন মহান চিত্রশিল্পীর আঁকা অপূর্ব চিত্রকর্মের মতো, প্রাঞ্জলি দার্শনিকের চিন্তাভুবন বদলে দেওয়া মতবাদের মতো, শব্দের মায়ায় বোনা অপরূপ দৃশ্যকল্পের কোনো কবিতার মতো। তৃর্যের মনে হয়, রাগ-রাগিণীর কাঠামোয় বোনা প্রাণজুড়েনো কোনো গানের সুর আর বিস্ময়কর কল্পনা কিংবা যুক্তিতে সাজানো গণিতের একেকটা ধারণা— কেউ কি কারও চেয়ে কম সুন্দর?

আহারে, গণিতের সৌন্দর্যগুলো যদি সবাই মন থেকে অনুভব করতে পারত! কেউ তাহলে আর কোনো দিন ভয় পেত না গণিতকে। যেই ভুবনের অলিতে-গলিতে এত আনন্দ ছড়ানো, কেন তাকে এত ভয় পায় মানুষ? ভাবতে ভাবতে ওর বুকটা অজানা সব আবেগে থইথই করে ওঠে।

### ১.৩

ওদিকে আবেগের তীব্রতায় আরেকজন মানুষ অস্থির হয়ে বসে আছে, দুই কিলোমিটার দূরে। এই মুহূর্তে তার আবেগের শতকরা ৪০ ভাগ দুঃখ-কষ্ট, ৩০ ভাগ হতাশা, ২০ ভাগ রাগ আর বাকি ১০ ভাগ লেখকও জানে না। টিনা, যাকে আড়ালে বন্ধুরা ডাকে ‘টেনশন টিনা’, পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ সেই মেয়েটা পৃথিবীর সব দুঃখ চোখে নিয়ে বসে আছে স্কুলের মাঠের এক কোনায়, মেহেগনি গাছের তলায়। চেখ দুটো ফোলা, গাল লাল, জামার হাতা ভিজে আছে কান্নার জলে। আপাতত তার বান্ধবী নীপা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে— একটু আগে যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা তেমন কোনো বিরাট ব্যাপার না— স্যার তো প্রতিদিনই একজনকে নয় আরেকজনকে হেনস্তা করেন। ‘তুই তো বেশ কয়েকটা উত্তর ঠিকই দিয়েছিলি, শুধু বোর্ডে ডাকার পর একটা অঙ্ক পারিসনি।’

টিনা অস্থির গলায় প্রতিবাদ জানায়, ‘দ্যাখ নীপা, তুই বিষয়টা বুঝতে পারছিস না। এটা শুধু একটা অঙ্ক না, এটা জীবনের ব্যাপার। দ্যাখ, এই সহজ অঙ্কটাই পারি না, আমি নিশ্চিত অঙ্কে ফেল করব। এসএসিতে রেজাল্ট খারাপ করব। বাবা রাগ হবেন। মা খেপে যাবেন। আমাকে

মেপে ফেলেছিলেন ইরাটোস্ত্রিনিস।

ছেলেটা আকাশের দিকে তাকায়, দেখে একটু করে মেঘ জড় হচ্ছে।  
রাতে বৃষ্টি হবে— এটাই আবহাওয়ার পূর্বাভাস। পূর্বাভাসে বলে দেওয়া  
আছে রাত ১২টায় শতকরা ৮০ ভাগ সম্ভাবনা আছে বৃষ্টি হওয়ার!  
তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, চাপ, বাতাসের গতিবেগ, গতিপথ মেপে গণিত  
জানিয়ে দিচ্ছে কখন বৃষ্টি হবে! কী দারুণ। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে এসব  
পরিমাপের যন্ত্রপাতি যত নিখুঁত হচ্ছে, কম্পিউটারের হিসাবক্ষমতা যত  
বাড়ছে, যত বেশি তথ্য বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে, তত বেশি নিখুঁত হয়ে  
উঠছে এই মডেলগুলো।

ছেলেটা রাস্তার দিকে তাকায়, পিচের রাস্তাটায় কী কী জিনিস কী  
অনুপাতে থাকবে, তার নিখুঁত হিসাব আছে। কী ওজনের গাড়ি  
কতগুলো চললে কত বছর রাস্তা ভালো থাকবে তার হিসাব আছে। সে  
যানবাহনগুলোর দিকে তাকায়, ছোট ছোট যন্ত্রগুলো কীভাবে বসালে,  
গাড়ি কীভাবে চলবে তার জটিল গণিত আছে।

হাতের মোবাইল ফোনটার দিকে তাকায় সে, ছোটখাটো একটা  
কম্পিউটার এটা। সারা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করছে এইটুকু যন্ত্র।  
এখানে বসে সে জেনে ফেলতে পারে, পৃথিবীর আরেক কোনায় কী  
ঘটছে এই মুহূর্তে। এর পেছনে সবচেয়ে বড় শক্তিগুলোর একটি হলো  
গণিত। ও ভাবে আর মুন্ফ হয়।

গাণিতিক ধারণাগুলো ব্যবহার করে মানুষ কত সহজে আপাত-অসাধ্য  
সব কাজ করে ফেলছে! ছেলেটা, যার নাম তৃর্য, অস্ত্রির হয়ে ভাবে, ইশ্‌,  
যদি সবাইকে বোঝাতে পারতাম, গণিতের ধারণাগুলো কী অসাধারণ  
রকম সুন্দর!

শুধু কী কাজে লাগে বলেই গণিত সুন্দর?

তৃর্য জানে, বিষয়টা মোটেই অমন না।  
বিশুদ্ধ গণিতের অনেক শাখা আছে,  
যেগুলো কোনো ‘কাজে’ লাগানোর  
জন্য তৈরি হয়নি। সেগুলো যেন শিল্পের

শুধু কী কাজে লাগে বলেই  
গণিত সুন্দর?

খুবই অসহায় এবং দুর্শিক্ষাগ্রস্তভাবে হোসনে আরাকে বললেন— আপা, বেশ কয়েক দিন ধরেই আপনার কাছে আসব ভাবছিলাম। আপনার একটা সাহায্য আমাদের খুব দরকার।

বান্টির মা বয়সে হোসনে আরা থেকে অনেক ছোট হবেন, হোসনে আরা সোফায় তার পাশে গিয়ে বসলেন। ভরসা দেওয়ার ভঙ্গিতে কাঁধে হাত রাখলেন। একটু নিচু গলায় বললেন— কী সাহায্য, আপা?

— আসলে আপা, সাহায্যটা লাগবে আপনার ছেলের থেকে। ও তো শুনেছি অঙ্কে খুব ভালো, গণিত অলিম্পিয়াডের সাথে কাজ করে। এই কয়েকটা দিন আমাদের বাচ্চাগুলোকে একটু দেখিয়ে দিক না।

এবারে তন্মুক্তির মা যোগ করলেন— জি আপা, তাহলে আমাদের খুব উপকার হয়। ওদের স্কুলে অঙ্কের এক স্যার আছেন। খুবই ভয়ংকর! প্রতিদিন একটা ছেলে, নাহয় একটা মেয়েকে এমন নাজেহাল করেন! সেটাতে বাচ্চারা কী যে কষ্ট পায়! তার থেকেও বড় ক্ষতি হলো, ওরা স্যারকে ভয় পেতে পেতে এখন পড়ালেখার ব্যাপারটাকেই ভয় পেতে শুরু করেছে।

হোসনে আরা মনে মনে ভাবলেন, এই সমস্যা মনে হয় সারা দেশেই। নিজে শিক্ষক হিসেবে জানেন, অধিকাংশ শিক্ষকই শুধু শেখান প্রশ্নে কী থাকলে উত্তরে কী লিখতে হবে। কেন কী হয় কেউ শেখান না। কেউ শেখান না কোথেকে এসব এল আর এসব শিখেই-বা জীবনে কী হবে! ফলে গণিত ব্যাপারটা দাঁড়ায় আন্দাজে কিছু নিয়ম মুখস্থ করে যাওয়ার মতো। অনেকের কাছে নিয়মগুলো সোজা লাগে, তারা পরীক্ষায় ভালো করে, যদিও জানে না নিয়মগুলো আসলে কেন। আর বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই এভাবে আন্দাজে অঙ্ক কষে যেতে পারে না, তারা পরীক্ষায় খারাপ করে। তখন ভয় চুকে যায় মনে— আমার দ্বারা গণিত হবে না।

হোসনে আরার মাঝে হয় বাচ্চাগুলোর জন্য। টিনার মা তন্মুক্তির মাকে বলে— আপনার তন্মুক্তি তো আপা অনেক ভালো! ও তো গান-বাজনা, অভিনয়, রচনা— কত কিছু করে, পুরস্কার পায়। আমার মেয়েটা তো সারা দিন কিছুই করে না, শুধু দুর্শিক্ষা করে। এইটুকু মানুষ, কী

চাপটাই না নেয়। এভাবে চাপ নিতে থাকলে, মেয়েটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। অসুস্থ হয়ে যাবে, উঠে দাঁড়াতেও পারবে না। আমাকে সারা দিন ওর পাশে বসে থাকতে হবে। তখন টিনার বাবাকে কে দেখবে? ওই মানুষটাও তো আমাকে ছাড়া নড়তে পারে না। টিনার বাবা ও যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে? দুই-দুইটা অসুস্থ মানুষ নিয়ে আমি কীভাবে থাকব? ওদের সেবা করতে করতে রান্নাবান্নার সময়ই পাব না। আপা, আমাদের মনে হয় না খেয়েই থাকতে হবে!

হোসনে আরা, তাঁর আম্মা, বান্টির আম্মা তিনজনই হেসে ফেললেন। টিনার ভেতরে দুশ্চিন্তার এই বাতিকটা কীভাবে এল তারা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। হোসনে আরা মজা করে টিনার আম্মুকে বললেন, ‘আপা, আপনাকে না খেয়ে থাকতে হবে না, আমরা খাবার দিয়ে আসব, চিন্তা নিয়েন না।’

তারপর কী একটা ভেবে একটু গন্তীর হয়ে হোসনে আরা বললেন—  
সবই ঠিক হয়ে যাবে, আপা। পৃথিবীতে কিছুর জন্যই কিছু আটকায় না।’

টিনার আম্মু আবার অস্তির হয়ে বললেন— তৃষ্ণকে একটু বলেন না, আমাদের বাচ্চাগুলাকে কয়েক দিন অঙ্ক দেখিয়ে দিক। ওদের মনে অনেক প্রশ্ন, কিন্তু সেগুলো কাউকে করতে পারে না। টিনা আমাকে বলে, কেউই নাকি প্রশ্ন করে না। প্রশ্ন করতে সবাই লজ্জা পায়, সবাই মনে করে অন্যেরা মনে হয় বুঝে ফেলেছে, শুধু ও একা বোঝেনি। তার ওপর একজন প্রশ্ন করলে অন্যেরা নাকি এমন ভাব নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, মনে হয় যেন তারা কত কিছু পারে। তখন প্রশ্নটা যে করেছে তার নিজেকে গাধা মনে হয়। যদিও সত্যি কথা হলো কেউই কিছু বোঝে নাই!

তাঁর মা যোগ করলেন, আপা, আমার তো মনে হয়, প্রশ্ন না করার আরও বড় কারণ হলো শাস্তির ভয়! একবার নাকি এক বাচ্চা ছেলে অঙ্ক মাস্টারকে কী একটা প্রশ্ন করেছিল। উনি নিজেই সম্ভবত উত্তর জানতেন না, উনি ধরে নিলেন তাকে অপ্রস্তুত করতেই মনে হয় ছেলেটা অমন প্রশ্ন করেছে। বেয়াদবির অপরাধে ওই নিষ্ঠুর লোকটা ছেলেটাকে

এমন জায়গায় পিটিয়েছিল, ওর গোসলখানার আয়না ছাড়া সেই দাগ নাকি আর কেউ দেখেনি! এখন অবশ্য আইন করে পেটানো নিষেধ করা হয়েছে, তাই ওনারা অত্যাধুনিক শাস্তির কায়দা তৈরি করেছেন, যেগুলো শরীরে দেখা যায় না। শুধু মনের মধ্যে কালো দাগ এঁকে দেয়। একবার যে তাদের ‘কিঞ্চিত’ অপমান শোনে, তার আর ক্ষুলে আসতে ইচ্ছে করে না।

বান্টির মা দুঃখী চেহারা নিয়ে বললেন— আমার ছেলেটার কথাই ধরেন না। ও লেখাপড়ায় ভালোই ছিল। ও নাকি অনেক প্রশ্ন করে, তাই অঙ্ক মাস্টার ওকে ফেল করিয়ে দিয়েছে। ছেলেটা যদি কারও কাছ থেকে শুধু ওর প্রশ্নগুলোর উত্তর পেত, তাহলেই হতো। এ জন্যই ভাবছিলাম তৃর্যের কথা। ও যদি একটু দেখিয়ে দিতে পারত...

কথার মাঝখানেই তৃর্য চুকল। সবাইকে সালাম দিয়ে ভেতরে চুকে যাচ্ছিল, তখন হোসনে আরা ওকে ডেকে পাশে বসালেন। — বাবা, এনারা আসলে তোর কাছেই এসেছেন। কৌতুহলী দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকায় তৃর্য। মা বলেন— তুই কি কয়েক দিন টিনা আর তৰীকে একটু অঙ্ক দেখিয়ে দিতে পারবি?

সত্যি কথা হলো, তৃর্যের ইচ্ছা ছিল ছুটিতে কোনো ঝামেলায় যাবে না। তবে মায়ের বাধ্য ছেলে সে। —কোনো অসুবিধা নাই, আম্মু। যদি সন্ধ্যার পর কোনো একসময় ওরা আসতে পারে, আমি দেখিয়ে দিতে পারব।

তৃর্য তৰী, টিনা আর বান্টিকে অঙ্ক দেখিয়ে দেবে শুনে একই ক্লাসের পৃথীর মাও অনুরোধ করলেন হোসনে আরাকে গিয়ে, তার ছেলেটাকেও একটু দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। ঠিক হলো ওরা চারজনই একসাথে পড়বে।

## অধ্যায় ২

## প্রশ্ন চলুক নির্ভয়ে

২.১.

প্রথম দিন পড়তে এসেই তৃর্যের ভঙ্গ হয়ে গেল ওরা চারজন। তৃর্য সারাটা সংক্ষ্যা গল্ল করেই কাটাল। কী করে গণিত অলিম্পিয়াডে যুক্ত হলো, কোথায় কীভাবে যায়, কী করে সেসব গল্ল শোনাল। এরপর ও বলল, গণিত কী অসাধারণ ক্ষমতা দেয় মানুষকে— ভবিষ্যৎ দেখার। ও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে এমন একটা ভঙ্গিতে বলল, ‘২০৩২ সালের ১৮ অক্টোবর রাত একটা দুই মিনিটে বাংলাদেশের আকাশে তাকালে দেখবে একটা পূর্ণিমা চাঁদ লাল টকটকে হয়ে যাবে।’ শুনে অবাক হয়ে গেল সবাই। তৃর্য গণিত নিয়ে অবলীলায় কথা বলে যায় আর ওরা মুঞ্চ হয়ে শোনে। বাসায় ফেরার পথে ওরা তৃর্যের একটা নামও দিয়ে দিল— অঙ্ক ভাইয়া!

অঙ্ক ভাইয়া ওদের শোনাল সিমুলেশন বা অগুক্রিয়া বলে একটা ব্যাপার আছে, যেটা নাকি প্রকৌশলের প্রায় সব জায়গায় ব্যবহার হয়। একটা যন্ত্র বানানোর আগেই কম্পিউটারে হিসাব করে বলে দেয় যন্ত্রটা কেমন আচরণ করবে। দালানকোঠা বানানোর আগেই হিসাব করে দেয় সে ভার নিতে পারবে কি না। এগুলো তো ভবিষ্যৎ দেখার মতোই একটা ব্যাপার, তাই না! তৃর্য গণিতবিদদের নিয়ে মজার গল্ল শোনায় ওদের। এসব শুনে ওদের একটু একটু সন্দেহ হতে থাকে, গণিত ব্যাপারটা মনে হয় অনেক আনন্দের! শুধু কেউ কখনো আনন্দটার কথা বলেনি বলেই ওদের যত ভয়।

তবে ওরা সবচেয়ে বেশি খুশি হলো যখন ভাইয়া দুই হাত প্রসারিত করে একগাল হাসি দিয়ে বলল, ‘তোমরা আমাকে গণিত নিয়ে ইচ্ছামতো প্রশ্ন করতে পারো, উলটা-পালটা, আবোলতাবোল, যেমন খুশি তেমন।’ ভাইয়ার জুলজুলে চোখ দুটো দেখেই ওদের মনে হচ্ছিল, ‘আমাদের কোনো ভয় নেই, আমরা যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারি!’ ওদের প্রথম প্রশ্নগুলোতে যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগের কোনো ব্যাপারই ছিল না।

প্রথম প্রশ্ন করল বান্টি। বাকিরা ভয় না পেলেও একটু আড়ষ্ট বোধ করছিল। বান্টি ওদের ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেগুলোর একজন, ভয়ড়র বলে কিছু নাই। ও একটা ফিচলে হাসি মুখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল,

**11=Onety one, 12=Onety two  
নয় কেন?**

ভাইয়া, যদি 21=Twenty one,  
22=twenty two হয়, তাহলে  
11=Onety one, 12=Onety  
two হলো না কেন?

তবী একটু খেপে গেল প্রশ্ন শুনে, ‘এটা কেমন প্রশ্ন? আমরা ভাইয়ার সময় নষ্ট না করে ভালো কোনো প্রশ্ন করি।’ ক্লাসের সব রকম অকাজের হোতা, দুষ্টের শিরোমণি বান্টি অন্য সময় হলে কঠিন কোনো জবাব দিয়ে দিত, কিন্তু এখন ও একটু দমে গেল, অঙ্ক ভাইয়ার সামনে এখনই নিজের ওই রূপটা সে দেখাতে চায় না!

তৃৰ্য ভাইয়াই বরং তবীকে থামিয়ে দিল। সে হেসে বান্টির পক্ষ নিয়ে বলল, ‘প্রশ্নের ভালো খারাপ নিয়ে ভেব না, প্রশ্ন করাটাই বেশি জরুরি। কৌতুহল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার! কখনোই কোনো বন্ধুকে প্রশ্ন করার সময় থামাবে না। এমনকি কোনো শিক্ষকও যদি তোমায় থামিয়ে দিতে চায়, ধরে নেবে সে নিজেই হয়তো ভালো করে ব্যাপারটা জানে না। এমন হলে অন্য কোনোভাবে জানার চেষ্টা করবে, তাই বলে প্রশ্নটা কখনোই মেরে ফেলবে না! এবারে তোমার প্রশ্নে আসি। কেন onety one, onety two হয় না, এটাই তো তোমার প্রশ্ন?’ বান্টি হাঁ-সূচক মাথা ঝাঁকাল। জানার আগ্রহ থেকে না, ও আসলে মজা করার জন্যই প্রশ্নটা করেছিল। কিন্তু ভাইয়া এত দারুণভাবে বিষয়টা নিয়েছেন, ওরও

খুব আগ্রহ হচ্ছে ভাইয়া কী বলে সেটা শনতে।

তৃষ্য ভাইয়া বলল, ‘এই প্রশ্নটা আমার জন্য একটু কঠিন। এখানে গণিত যতখানি তার থেকে বেশি হলো শব্দের ব্যৃৎপত্তি (etymology)। ইংরেজি শব্দগুলোর উৎপত্তি কীভাবে হলো সেটা নিয়ে একটা দারুণ ওয়েবসাইট আছে— Online Etymology Dictionary; সেটার ওপর ভিত্তি করেই উত্তর দিচ্ছি—

আমরা যখন লিখি twenty, সেখানে twen অংশটা এসেছে প্রাচীন ইংরেজি থেকে, যেখানে এর মানে ছিল দুই। আর ty এসেছে tig থেকে, যার মানে ছিল ‘Groups of ten’। অর্থাৎ twenty মানে হলো— এখানে ‘দশ এর দল’ আছে দুইটি। একইভাবে এসেছে Thirty, forty এগুলো। যখন একাধিক ‘দশ এর দল’ থাকে তখন প্রাচীন ইংরেজরা এমন করে বলত। এখন দেখো, যদি একটাই মাত্র দশ থাকে, তখন আর কতগুলো ‘দশ এর দল’ আছে সেটা ভেবে লাভ কী? একটা দশ এর দল বা ‘onety’ না বলে তারা শুধু বলত ‘দশ’ বা ‘ten’। এভাবে চিন্তা করতে পারো, আগে তো ‘দশ’ কী জিনিস সেটা বলতে হবে, তারপর ‘দশ এর দল’।

ten-এর পরে eleven এসেছে ellecovene শব্দটা থেকে, যার মানে ছিল ‘one left’— বা একটা অতিরিক্ত। এই শব্দটা যখন তৈরি তত দিনে গণনায় ১০ ভিত্তিক সংখ্যা প্রায় প্রতিষ্ঠিত। ধরে নেওয়া যায়, ব্যাপারটা এমন— কেউ হয়তো শুনছিল। ১০টা গোনার পরে দেখল আরও একটা অতিরিক্ত পড়ে আছে। এই হলো eleven— এগারো।

একইভাবে twelve এসেছে twelf থেকে, যার মানে ‘two left’ বা দুইটা অতিরিক্ত। এরপর thirteen, fourteen.. এগুলোতে—teen এসেছে ‘tiene’ থেকে যার মানে হলো ‘ten more than’. Thirteen মানে হলো ‘ten more than three’ বা ‘তিনের থেকে আর দশ বেশি!’ একটু উল্টো শোনাচ্ছে, না? ‘দশের থেকে আর তিন বেশি’ হলে বেশি সুন্দর লাগত। কী করা যাবে— যেভাবে এসেছে, সেভাবেই জানালাম তোমাকে।’

এবার টিনা হাত তুলল, ‘এ-জাতীয় একটা  
**1th 2th 3th** প্রশ্ন আমারও আছে। 1st 2nd 3rd এরপর  
**হলো না কেন?** 4th 5th 6th। 1th 2th 3th নয় কেন?  
 মানে th দিয়েই যদি সব করবে তো 1st 2nd 3rd  
 এর কী দরকার ছিল...?’

আমাকে তো বিপদে ফেলে দিলে, আমি যতটুকু জানি সেটা বলি।  
 1st তো First-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এই First এসেছে প্রাচীন ইংরেজি  
 (Old English) ভাষার ‘fyrst’ শব্দ থেকে, যার অর্থ ‘আদি, শুরু বা  
 প্রাথমিক’।

এই যে শেষে ‘-th’ থাকাটা এটাও এসেছে প্রাচীন ইংরেজি থেকে।  
 যদিও সেসময় এই th দিয়ে ওরা লিখত না। ওরা লিখত এই আজব  
 প্রতীকটা দিয়ে ‘þa’। þ ছিল ইংরেজির অনেক পুরোনো একটা অক্ষর,  
 যেটার উচ্চারণ ছিল আমাদের বাংলা ‘থ’-এর মতো। এরপর ‘second’  
 ইংরেজিতে এসেছে প্রাচীন ফ্রেঞ্চ ভাষা থেকে, প্রাচীন ফ্রেঞ্চ সেটা  
 পেয়েছে লাতিন শব্দ secundus থেকে। এর মানে ছিল ‘পরেরটা’।  
 মানে বুঝতেই পারছ—‘প্রথমটার পরেরটা’।

তারপর ‘Third’ এসেছে প্রাচীন ইংরেজি শব্দ থ্রিডা (þrida), এটার  
 মানেই ছিল ‘তিনি’।

**সাড়ে এক, সাড়ে দুই  
 নাকি দেড়, আড়াই?**

এরপরে আলাদা করে এমন কোনো ক্রমবাচক  
 শব্দ ওদের আর ছিল না। আর কী করা?  
 তখন নম্বরের শেষে –th লাগিয়ে শব্দ বানিয়ে  
 ফেলল। প্রথম তিনটা যেহেতু আগে থেকেই  
 প্রচলিত ছিল, ওগুলো আর তারা বদলায়নি। বাংলায় দেড়, আড়াই এই  
 শব্দগুলোর কথা ভাবো। এক এবং অর্ধেক মিলিয়ে দেড়। দুই আর  
 অর্ধেক মিলিয়ে আড়াই। কিন্তু এমন করে কতগুলো শব্দ বানাবে মানুষ।  
 তাই এরপর ‘সাড়ে’ ব্যবহার করে কাজ চালিয়ে নিয়েছি আমরা। সাড়ে  
 তিন, সাড়ে চার, এমন অনন্তকাল। এ প্রসঙ্গে বলি, বাংলায় দেড় শব্দটা  
 এসেছে সংস্কৃত দ্বি+অর্ধ= দ্বার্ধ থেকে। সম্ভিত ঠিক আছে তবে

বান্তি ফোড়ন কাটল— এটা আসলে বিয়োগ হবে ভাইয়া! দ্বি বিয়োগ  
 অর্ধ, তাহলে ঠিক থাকে।

তবী উৎসুক মুখে জিজেস করল— আর আড়াই শব্দটা কীভাবে এল?

— এটা উৎপত্তি অর্ধ+দুই থেকে। ওখান থেকে প্রাকৃত ভাষায়  
 ‘আড়চাইয়া’, সেখান থেকে আড়াই। এটা ঠিকই আছে!

পরের প্রশ্নটা করে পৃষ্ঠী— এক বড় ভাই  
 আমাকে বলেছিলেন, দুনিয়াতে অঙ্ক আছে মাত্র  
 দশটা— ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯।

এই দশটা প্রতীক দিয়েই সব লেখা যায়। কিন্তু  
 আমার প্রশ্ন হলো, শুধু ১০টাতেই থেমে গেল  
 কেন? কেন আরও প্রতীক আসল না?

তৃষ্য ভাইয়া একটু হেসে বললেন— ওনার কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়।  
 দেখো, এই দশটা দিয়ে সব লেখা যায় এটা সতি, তার মানে এই  
 না যে প্রতীক ঠিক দশটাই আছে। সংখ্যার ভিত্তি বলে একটা ব্যাপার  
 আছে। আমরা সাধারণভাবে যেভাবে লিখি, সেটা হলো ১০ ভিত্তিক  
 সংখ্যাব্যবস্থা। এখানে ১০টি প্রতীক। কিন্তু সংখ্যাব্যবস্থা ২ ভিত্তিকও  
 হতে পারে! কেউ দুই ভিত্তিতে লিখতে চাইলে শুধু ০ আর ১ দিয়েই  
 সব সংখ্যা লেখা সম্ভব। আবার প্রাচীন ব্যাবিলনে ব্যবহার করা হতো  
 ৬০ভিত্তিক সংখ্যাব্যবস্থা, সেখানে এই ১, ২, ৩-এর প্রতীক ছাড়াও  
 ১০-এর জন্য আলাদা প্রতীক ছিল। কম্পিউটারে খুবই প্রচলিত হলো  
 ১৬ভিত্তিক সংখ্যাব্যবস্থা, যেখানে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯,  
 A, B, C, D, E, F এই ১৬টা প্রতীক ব্যবহার হয়। তাই ১০-এই  
 শেষ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। মজার ব্যাপার কী জানো,  
 অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তা মনে করেন, প্রাচীন মানুষ গণনার জন্য তাদের  
 হাতের আঙুল ব্যবহার করত। আমাদের হাতে যেহেতু ১০টা আঙুল,  
 তাই ১০ ভিত্তি ব্যবহার করাটা ছিল সহজ। আমরা এখন যে ১০ভিত্তিক  
 সংখ্যাগুলো লিখি, সেখানে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের কিন্তু  
 একটা বড় অবদান আছে। কেউ কি জানো সেটা?

সাথে সাথে হাত তুলল তবী— জি ভাইয়া, শূন্যের আবিষ্কার হয়েছে  
ভারতীয় উপমহাদেশে।

ঠিক তাই। আর বাকি প্রতীকগুলো আরবদের তৈরি। এই সংখ্যাগুলোকে  
তাই হিন্দু-আরব সংখ্যাপ্রতীক বলে।

**০ আবিষ্কারের আগে  
১০, ২০ লিখত কীভাবে?**

টিনাকে কিছুটা বিভ্রান্ত দেখাল— ০ আবিষ্কার  
হলো ভারতীয় উপমহাদেশে। তাহলে এর  
আগে, কিংবা অন্য জায়গায় ১০, ২০, ৩০,  
৪০ ইত্যাদি কীভাবে লেখা হতো?

তৃর্য ভাইয়া বলল, এর আগে একেক জায়গায় একেকভাবে লেখা  
হতো! অধিকাংশ জায়গায় ১০-এর জন্য আলাদা প্রতীক ছিল! মিসরে  
হায়রোগ্নিফিক লিপিতে ১০ ছিল ॥-এর মতো দেখতে! ১০, ২০, ৩০  
ছিল ॥, ॥০, ॥০০, ॥০০০।

রোমানরা লিখত X দিয়ে যেটা এখনো প্রচলিত। X, XX, XXX ছিল  
ওদের ১০, ২০, ৩০।

মধ্য আমেরিকার মায়াসভ্যতা ছিল ২০ভিত্তিক! ওখানে ১০-এর জন্য  
যে প্রতীক সেটা ছিল = এর মতো! ২০-এর প্রতীক ছিল • এর মতো!  
৩০ লিখতে হলে ওই সমান চিহ্নের মতো চিহ্নটার ওপরে ডটটা বসাতে  
হবে! বুঝতেই পারছ, শূন্য হওয়ায় কাজ সহজ হয়ে গেছে অনেক।

পৃথী বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল। এতক্ষণ তবী অপেক্ষা করছিল একটা  
প্রশ্ন করার জন্য। এবার সে সুযোগ পেল।

**বাংলাদেশের আয়তন, নাকি ঘনমিটা  
১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি?**

ভাইয়া, আমার প্রশ্নটা  
বাংলাদেশ নিয়ে। অনেক  
দিন ধরেই ভেবেছি প্রশ্নটা  
কাউকে করব, ভয়ে করা

হয়ে ওঠেনি। এই যে আমরা বলি বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০  
‘বর্গকিলোমিটার’। এমন কেন বলা হয়? আয়তনের একক তো ঘন...  
আর যদি বর্গ কিমি বলতে হয়, তাহলে ক্ষেত্রফল বলি না কেন?

তৃর্য খানিকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এই প্রশ্নটা আমি প্রায়ই পাই,  
কেন যে এটা এখনো ঠিক করা হলো না! প্রথম কথা হলো, এখানে  
বর্গকিলোমিটার এককটা ঠিকই আছে, সমস্যা ‘আয়তন’ শব্দটায়।  
এটা আসলে Area, যেটা দিয়ে বোঝায় দ্বিমাত্রিক একটা ক্ষেত্র কতটুকু  
জায়গা দখল করে। আমি নির্দিষ্টায় মনে করি, এটাকে ক্ষেত্রফল বলা  
উচিত, তাহলে বিভ্রান্তিটা আর থাকে না।

এখানে মূল সমস্যাটা হয়েছে বাংলা অনুবাদের। কেউ কেউ Area শব্দটার  
অর্থ বাংলা করেছিলেন আয়তন আর কেউ করেছিলেন ক্ষেত্রফল। বাংলা  
অভিধানে দেখবে আয়তন আর ক্ষেত্রফল সমার্থক। কিন্তু এখন গণিত  
আর বিজ্ঞান বইগুলোতে আমরা স্পষ্টভাবেই দুটো শব্দকে আলাদা করে  
আর ব্যবহার করি Area-এর বাংলা ক্ষেত্রফল, যেটা ফেলেছি। আমরা  
একক হলো বর্গমিটার, বর্গসেমি এমন। আর Volume শব্দটার বাংলা  
হলো আয়তন, যেটা দিয়ে বোঝায় তিন মাত্রায় একটা বস্তু কতটুকু  
জায়গা দখল করে। এটার একক ঘনমিটার, ঘনসেমি ইত্যাদি।

এই যে যখন আমরা বলি, ‘১৪৭৫৭০ বর্গকিমি’, এটা দিয়ে আমরা  
যেটা মাপি সেটা কিন্তু তিন মাত্রার পরিমাপ না। এটা স্ফেক জমির মাপ,  
যেটা দ্বিমাত্রিক। বাংলাদেশের মোট জমি কতটুকু সেটার মাপ হলো  
১,৪৭,৫৭০ ‘বর্গকিলোমিটার’। ইংরেজিতে এটাকে কখনোই ভলিউম  
বলে না, বলে Area। Wikipedia-তে গিয়ে সারা পৃথিবীর সব দেশের  
Area দেখতে পাবে, দেখবে সব খানেই একক বর্গকিমি। এ জন্য সব  
বইয়ে ক্ষেত্রফল বলাটাই যুক্তিযুক্ত। তাহলে ছেলেমেয়েরা অথবা বিভ্রান্ত  
হবে না।

পৃথী মাথা চুলকে বলল, কিন্তু ভাইয়া, বাংলাদেশ তো দুই মাত্রিক না।  
আমার জানা মতে, আকাশমণ্ডলীও একটা দেশের অংশ। নইলে এক  
দেশের ওপর দিয়ে আরেক দেশের বিমান যেতে অনুমতি লাগে কেন?  
কোনো দেশের জায়গা মাপার সময় আকাশমণ্ডলীও হিসাবে ধরার  
কথা...। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে আয়তন কথাটা আসে...।

তৃর্য পরিষ্কার করল, তোমার কথায় যুক্তি আছে। আকাশমণ্ডলী দেশের  
অংশ এটাতে সন্দেহ নেই। আর আকাশমণ্ডলীকে হিসাবে ধরলে

আয়তন বলতে হবে এতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি বলছি কী করা হয়। সত্যিটা হচ্ছে এই ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিমির হিসাবের ভেতরে আকাশমণ্ডলীর কোনোই ব্যাপার নেই। হিসাবটা আরও সোজা। ধরা যাক তোমার ১ বিঘা জমি আছে। তোমার প্রতিবেশীর আছে ১ বিঘা! কয়েক বিঘা আছে নদীর ভেতর। এমন করে সারা দেশের সব জমি মাপলে পাওয়া যাবে ১০ কোটি ৯৩ লাখ ১১ হাজার ১১১ বিঘা। এক বিঘা = ০.০০১৩৫ বর্গকিমি, তাহলে ১০,৯৩,১১,১১১ বিঘা হবে ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিমি! ব্যাপারটা এইটুকুই, সুলভাগ-জলভাগ সব মিলিয়ে দেশের সব জমির যোগফল হলো তার ক্ষেত্রফল। আমার মনে হয় এটা ধীরে ধীরে বইগুলোতে শুধরে নেবে।

পৃথীবী এখনো যেন মানতে চায় না। ভাইয়া, তাহলে কি বাংলাদেশের আয়তন বলে কিছু হতে পারে না?

তৃৰ্য বলল, অবশ্যই পারে। চলো চিন্তা করি সেটা কী হবে। প্রথমে মনে করি পৃথিবী সমতল।

এটা বলেই তৃৰ্য হেসে ফেলল, জানো, এই যুগেও বহু মানুষ বিশ্বাস করে পৃথিবী সমতল। গোলাকার পৃথিবীর হিসাব মেনে প্রতিদিন লাখ লাখ বিমান ছুটে যাচ্ছে এ মাথা থেকে ও মাথায়। স্যাটেলাইট, মোবাইল ফোনে কোটি কোটি মানুষ যোগাযোগ করছে— সেখানে লাগে গোলক-পৃথিবীর নিখুঁত মডেল। মহাকাশ থেকে পাঠানো হাজার হাজার গোলক আকৃতির ছবি— এই সব থাকার পরেও কিছু মানুষ এভাবেই ভাবতে থাকে, কী হাস্যকর!

## বাংলাদেশের আয়তন কত ঘন কি.মি?

যাহোক আবার বাংলাদেশের আয়তনে ফিরি। বাংলাদেশকে ধরলাম সমতল। সমতল জায়গার ক্ষেত্রফলের সাথে উচ্চতা গুণ করলেই আয়তন পাবে। কিন্তু সেই উচ্চতাটা কত? কত ওপরে গেলে আর বাংলাদেশ থাকবে না? আরও ভালো করে বললে, কোন উচ্চতার পরে আর পৃথিবী থাকবে না, থাকবে শুধু মহাশূন্য? এটা নিয়েও সব

একটা উচ্চতার। তারা প্রস্তাব করেছে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০ কিমি উচ্চতায় একটা সীমানারেখা কল্পনা করতে। এর নিচে পৃথিবী, ওপরে গেলে শুরু হয় মহাশূন্য। আবার আমেরিকা বলে, কেউ ৮০ কিমির উচ্চতে ভ্রমণ করলেই তাকে নভোচারী বলা হবে। কী বামেলা! তো চলো, আমরা কারমান রেখাটাকেই আদর্শ ভাবি। ধরলাম বাংলাদেশের ওপরে যে বায়ুমণ্ডল আছে, এটার উচ্চতা গড়ে ১০০ কিমি। তাহলে বাংলাদেশের আয়তন বা ভলিউম হবে  $১৪৭৫৭০ \times ১০০ = ১,৪৭,৫৭,০০০$  ঘনকিমি। আবার কিন্তু আমাদের একক হবে ঘনকিমি। তবে, এখানে একটা বড় তলায় যদি রঞ্জ পাওয়া যায়, সেটা কি দেশের সম্পদ না?

তাই তো, এটার কথা তো ভাবি নাই!

হ্যাঁ, তাহলে মাটির তলার জায়গাটাও তো আয়তনের ভেতরে নিতে হবে। এবং সত্য হলো, মাটির ওপরে দেশের জায়গা যতটুকু, নিচে তার চেয়ে অনেক বেশি। পৃথিবীটা তো প্রায় গোলক আকৃতির, যার গড় ব্যাসার্ধ প্রায় ৬৩৭০ কিমি। তার মানে মাটির তলায় ৬৩৭০ কিমি গেলেও সেটা বাংলাদেশের থাকবে!

এরপর তৃৰ্য একটা হিসাব করল। ও বলল, এই সব ক্ষেত্রে আয়তনের হিসাব করা যায় একটা গোলকের চাপ চিন্তা করে। গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল  $4\pi R^2$  আর আয়তন  $\frac{4}{3}\pi R^3$  এটা তো তোমরা জানো, তাই না?

জানি, কিন্তু কেন হয়, সেটা জানি না।

আচ্ছা সেটা আমি বুঝিয়ে দেব, আজকে ওটা জানো ধরে নিয়েই হিসাবটা করি। তৃৰ্য খাতায় লিখল ঐকিক নিয়মের মতো করে—



ক্ষেত্রফল  $4\pi R^2$  হলো কেন্দ্রে আয়তন হয়  $\frac{4}{3}\pi R^3$

ক্ষেত্রফল 1 " " "  $\frac{(\frac{4}{3})\pi R^3}{4\pi R^2}$

ক্ষেত্রফল 147570,,,, $\frac{(\frac{4}{3})\pi R^3}{4\pi R^2} \times 147570$

ব্যাসার্ধ R-এর মান ও বসালো ৬৩৭০ কিমি। তাতে আয়তন দাঁড়াল ৩১,৩৩,৪০,৩০০ ঘনকিমি। এটা হলো বাংলাদেশের মাটির তলায় কতটুকু জায়গা আছে, সেটার একটা অনুমান। তাহলে মাটির ওপরের অংশের সাথে যোগ দিলে পাওয়া যাবে  $(1,87,57,000 + 31,33,40,300) = 32,80,97,300$  ঘনকিমি।

হিসাব শেষ করে তৃঢ় হাসল। এই নাও, এটা হলো বাংলাদেশের আয়তন। এটাকেই যেন আসল আয়তন মনে করো না! আমি একেবারে প্রাথমিক, একেবারে সরল একটা অনুমান করলাম। নিখুঁতভাবে করতে গেলে আয়তন বের করা অনেক কঠিন। আমি যে ওপরের অংশকে সমতল ধরলাম সেটা ঠিক না। সেটাকে গোলকের অংশ ধরলে আয়তন আরেকটু বেশি আসত, আরেকটু ভালো অনুমান পেতাম। সেটা করা সহজ<sup>১</sup>, তবে সেটাও একশ ভাগ নিখুঁত হতো না। কারণ পৃথিবীটা সূষ্ম গোলক না, একেক অক্ষাংশে এর ব্যাসার্ধ একেক রকম। গোলকের হিসাব ঠিক থাকবে না সব সময়। আবার আকাশসীমা ঠিক কতখানি, এটা নিয়ে সংশয়ের কথা তো বললামই। এসব কারণে আয়তন না নিয়ে ক্ষেত্রফল ভাবাটা সহজ। সাধারণ মানুষের হিসাবের জন্য, দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের জন্য জমির ক্ষেত্রফল মাপাটাই সুবিধাজনক।

এবার আর পৃথীর কোনো দ্বিধা রইল না, সে বুঝল ক্ষেত্রফল বলাটাই কেন যুক্তিযুক্তি।

<sup>১</sup> সেক্ষেত্রে দুইটা গোলক ভাবলেই হয়, একটার ব্যাসার্ধ ৬৩৭০ কি.মি.। আরেকটা একটু বড়, উপরের আকাশসীমাসহ। সেটার ব্যাসার্ধ  $(6370+100)=6470$  কি.মি.। পুরো গোলকের আয়তন যখন  $(8/3)\times\pi\times6370^3$ , তখন ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত বাংলাদেশের আয়তন ৩১,৩৩,৪০,৩০০। তাহলে পুরো গোলকের আয়তন যখন  $(8/3)\times\pi\times(6370+100)^3$ , ৩১,৩৩,৪০,৩০০। তাহলে আকাশসীমা পর্যন্ত বাংলাদেশের আয়তন হবে  $31,33,40,300+(8/3)\times\pi\times6370^3$  যুক্তি হয়।

এমন সব প্রশ্নের মাঝে কখন দুই ঘন্টা পার হয়ে গেছে কেউ বুঝাতেই পারেনি। আইনস্টাইন আপেক্ষিকতা বোঝাতে একবার নাকি মজা করে বলেছিলেন, ভালো সময় দ্রুত কাটে। তৃর্যের মনে হলো সবাই অনেক ভালো সময় পার করছে। ওদের আর কটা দিন দীক্ষা দিলেই গণিতে আর ওরা ভয় পাবে না!

তৃঢ় টেবিলের ওপর একটা বই দেখিয়ে বলল, এই বইটার তলায় চারটে ভাঁজ করা কাগজ আছে চারজনের জন্য, সেখানে তোমাদের জন্য আছে একটা ধাঁধা। এটা এখন খোলো না, নিয়ে যাও সাথে করে! ভেবো সময় পেলে!

সবাই বের হয়ে এল দারুণ উৎসাহ নিয়ে। এত দিন পরে কাউকে পেয়েছে যাকে মন খুলে প্রশ্ন করা যায়! **বর্গপুরুর ধাঁধা** আর ধাঁধার কাগজে কী লেখা, সেটা নিয়েও দারুণ কৌতুহল মনের ভেতর। টিনা তো উত্তেজনা দমনই করতে পারল না, রাস্তায় পৌরসভার সড়কবাতির টিমটিমে আলোতেই পড়ে ফেলল তার কাগজে কী লেখা—

বর্গাকার এক পুরুর ছিল— পুরুর ভরা মাছ,

চারটে কোনায় পৌঁতা ছিল চারটে পুরোনো গাছ!

পুরুরটাকে বাড়াতে হবে, ক্ষেত্র হবে দ্বিগুণ।

গাছ কেটো না! বাড়ির মালিক রেগেই হবে আগুন!

পুরুর যেন বগই থাকে, এটাও রেখো স্বরণ!

বলো দেখি, কেমন হবে পুরুর কাটার ধরন?

রাতে খাবার পর টিনা খাতা-কলমে এঁকে ফেলল ছবিটা। সমাধান করতে বেশি সময় লাগল না ওর।

ওদিকে তৃঢ় মনে মনে হাসে, প্রথম দিনের ধাঁধা তো, বেশি কঠিন কিছু দিইনি। ধাঁধা আরও আসবে, তোমাদের ভাবিয়ে ভাবিয়ে গণিতে দারুণ আগ্রহী করে তুলব, এটা আমার চ্যালেঞ্জ!

## অধ্যায় ৩

### সংখ্যা নিয়ে সংশয়

**৩.১**

চার বছর আগে এই শহরে প্রথম এসেছে তৃষ্ণ। এই কয়েক বছরেই শহরটাকে খুব আপন মনে হয় তার। বুয়েটে ড. এম এ রশীদ হলে নিজের ঘরে বসে যখন মন খারাপ লাগে, তখন সে চোখ বুজে এই শহরটাকে দেখে। আর ছুটিতে এলে প্রায়ই দুপুরের একটু আগে ঘুরতে বের হয় সে, একাই। কখনো প্রিয় সাইকেলটা নিয়ে, কখনো বা হেঁটেই। আজও মূল সড়কের ফুটপাথ ধরে হাঁটছিল সে, আনমনে। হাঁটতে হাঁটতে তার কলেজের এক প্রিয় শিক্ষকের উত্তি মনে পড়ে।

বাবারে, যা কিছু চোখের সামনে দেখিস, দেখলেই সব ‘জ্ঞান’ হয়ে যায় না, সব মাথায় থাকে না। সেগুলো জ্ঞান বানাতে লাগে ‘চিন্তা’। বাসা থেকে বের হয়ে রাস্তায় চলতে চলতে যতগুলো দোকান দেখিস, তার কতগুলোর নাম মনে করতে পারবি? অধিকাংশই পারবি না। কিন্তু মোড়ের দোকানে ‘তৃষ্ণ জেনারেল স্টোর’টার নাম কিন্তু ঠিকই মনে থাকে। কেন? কারণ ওটা দেখলেই তোর মনে হবে, আরে, এটা তো আমার নামে নাম। এই যে একটু চিন্তা করলি, এটা খুব জরুরি। তোর ভাবনাটা তোর মাথার ভেতরে নিউরনগুলোর মাঝে একটা সেতু বন্ধন তৈরি করবে। চিন্তাটা ছাড়া ওই সেতু তৈরি হবে না...। এটা জানা থাকলে জীবনে অনেক কিছু সহজে করা যায়। ধর, কিছু একটা আছে যেটা তুই মনে রাখতে চাস, কিন্তু কিছুতেই মনে রাখতে পারছিস না। বারবার ভুলে যাচ্ছিস। চেষ্টা কর, ওটা নিয়ে একটা ছন্দ বাঁধার, কিছু

একটা তৈরি করার। দেখবি ছন্দ বাঁধতে পারিস আর না পারিস ওই ব্যাপারটা মনে থাকবে। এই যে তুই ভাবছিস, চিন্তার চেষ্টা করছিস, এটাই নতুন নতুন স্মৃতি, নতুন নতুন জ্ঞানের বন্ধন তৈরি করে ফেলবে।

কলেজে পড়ার সময় কথাগুলো মনে অতটা দাগ কাটেনি, কিন্তু এখন তৃষ্ণ অনুভব করে, ব্যাপারটা ঠিক তা-ই! শুধু চিন্তা করেও অনেক কিছু বের করে ফেলা যায়। তার মনে পড়ে ‘Alphabet’ শব্দটা কোথাকে এল—এটা ভাবতে গিয়েই সে বুবো ফেলেছিল, এটা নিশ্চয়ই গ্রিক অক্ষর আলফা আর বেটা যোগ করে হয়েছে! কেউ কিন্তু তাকে বলে দেয়নি, ভাবতে গিয়েই বুবো ফেলেছে। জানা আর না জানার ভেতরে পার্থক্য শুধু ওই চিন্তার সময়টা!

এই সব ভাবতে ভাবতে সে খেয়াল করে হাঁটতে হাঁটতে বাণ্টি-তন্ত্বীদের স্কুলের কাছে পৌছে গেছে। স্কুলের দিকে তাকিয়ে গতকালের কথা মনে হয়। পৃথী খুব মন খারাপ করে বলছিল গণিত কেন ভালো লাগে না, তার কথা। শুধু একটা ছোট সূত্র ভুলে যাওয়ায় নজিবুল্লাহ স্যার বাবা-মা তুলে কী অপমানটা তাকে করেছে, খুব কষ্ট নিয়ে বলছিল পৃথী। শুনে রাগ হয়েছিল তৃষ্ণের, মনে হয়েছিল যদি কখনো লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলা যেত। গণিতের মতো একটা ভালোবাসার বিষয়কে যে এমন বাজে ব্যাপার বানিয়ে ফেলতে পারে, তাকে কড়া কিছু কথা শুনিয়ে দেওয়া উচিত।

তৃষ্ণ তখনো জানত না আর দুই সপ্তাহ পরেই তাকে মুখোমুখি হতে হবে নজিবুল্লাহ স্যারের। অনেক প্রস্তুতি নিয়ে যাবে সে, কিন্তু তৃষ্ণের মনমতো কিছুই ঘটবে না সেই দিন!

**৩.২**

সন্ধ্যা ছয়টার আসার কথা ছিল টিনা-তন্ত্বীদের। ওরা পাঁচ মিনিট আগেই এসে হাজির। তৃষ্ণ বুবাল ওদের মধ্যে আগ্রহ জন্মাচ্ছে। সে পড়ানো শুরু করল আজ সকালে যা ভাবছিল সেটা ওদের সাথে ভাগ করে নিয়ে। চিন্তা করাটা যে জরুরি সেটা বোঝাতে ও উদাহরণ টানল মুরগির!

চিন্তা থেকেই মানুষ তৈরি করে কান্সনিক সব ধারণা। আর সেগুলো কী অবলীলায় মিশে যায় তার বাস্তব জগৎটার সাথে। একটা দুই পাআলা একটা পাখি হাঁটছিল, যার ওড়ার প্রতি কোনো আগ্রহ নাই। হয়তো কেউ সেটার একটা 'নাম' দিয়ে দিল—'মুরগি'। এই মুরগি নামটা নিয়ে কিন্তু সে জন্মায়নি। সব ভাষায় তাকে 'মুরগি' বলেও না। তবু এই যে নামটা মানুষ দিল, তাতে কিন্তু লাভ হলো অনেক। একটা শব্দ বললেই বাংলাভাষী সবাই বুঝে যায় কোন পাখিটাকে বোঝানো হচ্ছে। খাদ্যপ্রেমী কেউ কেউ শব্দটা শোনার সাথে সাথে রোষ্ট, বাল-ফ্রাইজির মতো উপাদেয় তরকারি ও কল্পনা করে ফেলতে পারে।

এটুকু বলার পর গণিতের রাজ্যে ঢুকে গেল তৃষ্ণ।

### **সংখ্যার শুরু কোথায়?**

এমন একটা কান্সনিক ধারণা হলো 'সংখ্যা'।

কোনটাকে 'এক' বলবে, কোনটাকে 'দুই', এটা মানুষ তার কল্পনা দিয়ে নাম দিয়েছে। ঠিক কতটা জিনিস আছে, এসব গুনতে মানুষ একসময় দাগ দিয়ে পাথরের গায়ে লিখে রাখত। এটাকে বলে টালি করা। ধরো, ভেড়ার রাখাল তার কতগুলো ভেড়া আছে গুনতে চায়। সে একটা ভেড়ার জন্যে হয়তো একটা দাগ দিত। সেটার শুরুও প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে।

বান্টি দাঁত কেলিয়ে বলল, অত আগের জিনিস মানুষ কী করে জানল?

**অনেক অনেক বছর আগে**

**জিনিসপাতির বয়স বের করত কিভাবে?**

হাড় পাওয়া যায়, যার গায়ে অনেকগুলো দাগ কাটা। বহু গবেষণায় মানুষ নিশ্চিত হয় যে এটা কোনো মানুষেরই কাজ। তারা গণনার কাজে এটা ব্যবহার করেছিল। এরপর গবেষণা করা হয় এই হাড়টা কত বছর আগের সেটা বের করার। সেটা করার জন্য কার্বন ডেটিং বলে একটা ব্যাপার আছে। প্রাণী বা জীবদেহে অনেক কার্বন পরমাণু থাকে, যার মধ্যে বেশ কিছু থাকে সাধারণ কার্বন থেকে ভারী বিশেষ একধরনের কার্বন পরমাণু, যারা তেজস্ক্রিয়! জীবটি যখন জীবিত থাকে তখন প্রকৃতিতে অন্য জীবের সাথে এই তেজস্ক্রিয় কার্বন আদান-প্রদান

করতে পারে। মরে গেলে সেটা আর পারে না। তখন কী হয়? যেকোনো তেজস্ক্রিয় পরমাণু খুব আস্তে আস্তে বিভিন্ন রশ্মির আকাশে শক্তি বিকিরণ করতে থাকে, করতে করতে সেটা অন্য পরমাণু হয়ে যায়। তেজস্ক্রিয় কার্বনও এভাবে বেটো রশ্মি বিকিরণ করতে করতে যায়। তেজস্ক্রিয় কার্বনও এভাবে বেটো রশ্মি বিকিরণ করতে করতে যায়। এখন এই তেজস্ক্রিয় কার্বন কত কার্বন থেকে নাইট্রোজেন হয়ে যায়! এখন এই তেজস্ক্রিয় কার্বন কত সময় ধরে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করে, সেটা মানুষের জানা আছে। প্রকৃতিতে সাধারণ কার্বন আর তেজস্ক্রিয় কার্বনের অনুপাত কেমন তার থেকে সে বলতে পারে শুরুতে তেজস্ক্রিয় কার্বন কতটুকু ছিল। আর এখন নাইট্রোজেন কতটুকু সেটা থেকে বোঝা যায় কতটুকু তেজস্ক্রিয় এখন নাইট্রোজেন কতটুকু সেটা থেকে বোঝা যায় কতটুকু তেজস্ক্রিয় কার্বন ক্ষয় হয়ে গেছে এর মাঝে। এই তথ্যগুলো থেকে সে বলে দিতে কার্বন ক্ষয় হয়ে গেছে এর মাঝে। তো গবেষকেরা দেখেছেন ৬৫ লেবোম্বো হাড়টা ছিল ৪৪ হাজার বছর আগের!

পৃথী চোখ বড় বড় করে, হাঁ করে শুনছিল। ক্লাসে ওর চোয়ে বড় হা আর কারও নেই। পৃথীকে যখন স্যারেরা বকা দেন, সে হা করে তাকিয়ে থাকে। যখন থাকে। যখন বৃষ্টি হয়, জানালা দিয়ে সে হা করে তাকিয়ে থাকে। যখন বান্টি বিটলামো কেউ হাসির কথা বলে, যখন তবী গান করে, যখন বান্টি পঢ়ান, করে, সে হা করে তাকিয়ে থাকে। স্যার-ম্যাডামরা যখন ক্লাসে পঢ়ান, তখনো সে মুক্তি দৃষ্টিতে তাদের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে। সে যেভাবে ব্যাকবোর্ডের দিকে তাকায়, ভুলিয়েটও কোনো দিন রোমিওর দিকে ওভাবে তাকায়নি। বন্দুরা বিশ্বাস করে নিশ্চয়ই কিছু ফলের মাড়ি তার আশ্চর্য হা দিয়ে প্রায়ই তার মুখের ভেতরে ঢুকে যায়। পৃথীকে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে বিভ্রান্ত হয়ে আবার বেরিয়ে যায়। পৃথীকে ক্লাসের সবাই ডাকে 'অবাক পৃথিবী'। এখন ওকে ভাইয়ার দিকে এভাবে অবাক, বেঁচে আছিস, না কার্বন ডেটিং করব?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে সে তৃষ্ণ ভাইয়াকে বলল, কী সাংঘাতিক! গণিত তো দেখি টাইম-ট্রাভেলও করতে পারে। এত আগের ব্যাপার বলতে পারে?

তৃষ্ণ বলল, হ্যাঁ! এই লেবোম্বো হাড়ে যেভাবে দাগ ছিল তাতে বোঝা

ওরা ওয়ু শুনতেহ পারত। হয়তো যোগ-বিয়োগ কিছুটা বুকাত—  
সংখ্যা কমে যাওয়া-বেড়ে যাওয়া থেকে, কিন্তু গুণ, ভাগ বা আরও  
জটিল কিছু জানত না। এ রকম আরেকটু উন্নত গণিত এবং প্রথম  
সংখ্যাব্যবস্থা দেখা যায় প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতায়, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০  
অদ্বৈত দিকে।

তবী বলল, ‘সুমেরুতে? খুব ঠান্ডা জায়গা, না ভাইয়া? পৃথিবীর  
একেবারে উভরে?

**সুমার কি সুমেরুতে?** তৃষ্ণ ভাইয়া শব্দ করে হেসে ফেলল, ‘না, সুমেরু  
আর সুমার এক না। সুমার হলো এখন যেখান  
ইরাক, অনেকটা সেখানে। ওখানেই ছিল পৃথিবীর প্রথম নগর সভ্যতা,  
ওই এলাকাতেই জন্ম সংখ্যাতত্ত্ব আর পাটিগণিতের। দজলা-ফোরাত  
নদীর তীরের ওই অঞ্চলটা, যাকে আধুনিক ইতিহাসবিদেরা বলেন  
'মেসোপটেমিয়া'— পৃথিবীর প্রথম গণিত বিকশিত হয়েছিল সেখানেই!  
সুমেরীয় সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার পর কাছাকাছি এলাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়  
অ্যাকাডীয় সভ্যতা, অ্যাসিরীয় সভ্যতা। আরেকটু পরে ওখানেই প্রতিষ্ঠা  
হয় আর একটা সভ্যতার, যার ব্যাপ্তি ছিল অল্প— কিন্তু খ্যাতি সবচেয়ে  
বেশি। তোমরা হয়তো নাম শুনে থাকবে— ব্যাবিলন!

তবী বলল, ও আচ্ছা, ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যানের গল্প শুনেছি। রাজা  
নেবুচাদনেজার নাকি একটা প্রাসাদ বানিয়েছিলেন রানিকে খুশি করতে।  
রানির দেশের বাড়ি ছিল সবুজ পাহাড়-উপত্যকাময় আর ব্যাবিলন ছিল  
রুক্ষ শুষ্ক। তখন রাজা ভেবেছিলেন ব্যাবিলনেই পাহাড়সমান একটা  
সবুজ বাগান করে দেবেন। মাটির অত ওপরে বাগান, সেটা দেখে  
লোকে ভাবত শুন্যে ঝুলছে উদ্যান।

**৬০ মিনিটে ১ ঘণ্টা, ১২ বছরে ১ যুগ।**  
**কেন ৬০, কেন ১২? কেন ২৫ বা ২৬ নয়?**

হ্যাঁ। তবে ওই বাগান  
ছাড়া আরও অনেক  
কারণে পৃথিবী ব্যাবিলনের  
কাছে ঝণী। এই যে আমরা বলি, ৬০ সেকেন্ডে ১ মিনিট। ৬০ মিনিটে  
এক ঘণ্টা, ১২ বছরে ১ যুগ— অমন ৬০, ১২ এই সংখ্যাগুলো কোথেকে  
এল, জানো?

বান্তি বলল, এইটা আমারও প্রশ্ন। কেন ১২, কেন ৬০? কেন ২৫ না,  
২৬ না।

তৃষ্ণ জানিয়ে দিল প্রশ্নটার উভর শতভাগ নিশ্চিত করে জানা নেই, তবে  
অধিকাংশ ইতিহাসবিদ মনে করেন এর কারণটা প্রাচীন গণনাপদ্ধতির  
মধ্যে নিহিত।

‘৬০-ভিত্তি সংখ্যাব্যবস্থা প্রথম দেখা গিয়েছিল প্রাচীন সুমেরীয়  
সভ্যতায়। এরপর ব্যাবিলনীয় সভ্যতাতেও এর দেখা মেলে। ওরা  
যেভাবে শুনত— সেটা দেখলেই বোঝা যায় ১২-এর বাপারটা।  
(এখনো পৃথিবীতে অনেক জায়গায় এভাবে গোনার চল রয়ে গেছে)  
এবার দেখি সেই গোনার উপায়টা।

আমরা হাতের আঙ্গুলের কর শুনি, ওরা শুনত  
দুইটা করের মাঝখানের জায়গা বা আরও  
ভালো করে বললে আঙ্গুলের হাড়! একটু  
তাকালেই দেখা যাবে বুড়ো আঙ্গুল বাদে  
প্রতিটা আঙ্গুলে ছোট ছোট তিনটা করে হাড়  
আছে। আমরা যেভাবে বুড়ো আঙ্গুলের মাথা  
দিয়ে শুনি, ওরা ও বুড়ো আঙ্গুলকে একইভাবে  
ব্যবহার করত গোনার নির্দেশক হিসেবে।  
বুড়ো আঙ্গুল বাদ দিলে বাকি থাকল চারটে  
আঙ্গুল, প্রতিটায় তিনটে করে হাড়। এই  
মোট ১২টা।

ওরা গোনা শুরু করত ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের মাথাটা ওই হাতেরই  
কড়ে আঙ্গুলের ওপরের ভাগে রেখে, এরপর ছবির মতন নিচে নামত,  
তারপর পাশের আঙ্গুলে যেত। এক হাত দিয়ে ওরা সর্বোচ্চ ১২টা পর্যন্ত  
শুনতে পারত।

চিনা বলল, আমরা মনে হয় আরেকটু বুদ্ধিমান। আমরা তো এক  
হাতেই কর শুনে শুনে ২০ পর্যন্ত শুনতে পারি!

তৃষ্ণ হেসে বলল, হতে পারে। তবে মনে রেখো এটা এখন থেকে পাঁচ



জান্তাতে এভাবে ১ থেকে  
১২ পর্যন্ত গোনা হতো

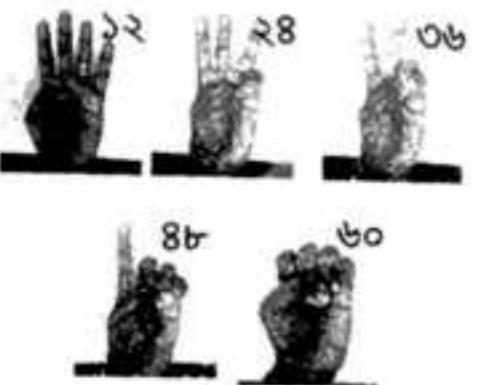
হাজার বছর আগের ব্যাপার! যাহোক, অধিকাংশ ইতিহাসবিদ মনে করেন ওখান থেকেই এসেছে ১২-এর ব্যাপারটা। এরপর সে একটা ছবি এঁকে দেখাল।

পৃথী হাঁ করে শুনছিল, সে অবাক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, এ তো গেল ১২। আর ৬০ কোথেকে এল?

এটা বুঝতে ডান হাতের সাথে সাথে এবার বাম হাতও লাগবে! ডান হাত দিয়ে তো ১২ পর্যন্ত গোনা হলো। এই ১২ গোনা শেষ হলে তারা অন্য হাতের মানে বামহাতের একটা আঙুল বন্ধ করত।

তৃৰ্য ডান হাত দিয়ে ১২ পর্যন্ত গুনে

বাম হাতের কড়ে আঙুল ভাঁজ করল। এরপর আবার ডান হাত দিয়ে আরও ১২টা গুনল। গোনা শেষ হলে বাম হাতের কড়ে আঙুল বন্ধ করল। এভাবে ডান হাতে ১২টা গোনে আর গোনা শেষ হলে বাম হাতের একটা



বামহাতের ক্ষেত্রে কতগুলো আঙুল বন্ধ সেটাই মুখ্য।  
তিনটা আঙুল বন্ধ মানে  $12 \times 3 = 36$  বোঝাবে।

করে আঙুল বন্ধ করে। এমন করে যখন বাম হাতের পাঁচটা আঙুলই বন্ধ হয়ে গেল, তখন সবাইকে বলল, তাহলে তোমরা বলো তো মোট কতগুলো গোনা হলো?

বান্টি বলল, একটা আঙুল ভাঁজ করলে গোনা হয় ১২, তাহলে পাঁচটা আঙুল ভাঁজ করলে হবে পাঁচ বারোং ষাট!

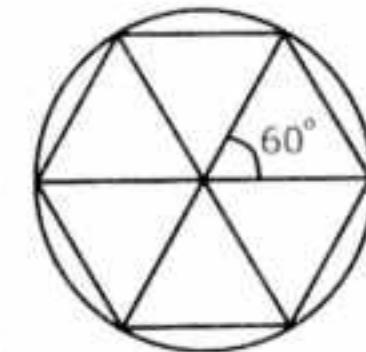
ঠিক তা-ই! এভাবেই এল ৬০।

পৃথী হাঁ করে বলল, কী সাংঘাতিক!

তৃৰ্য পৃথীর হাঁ-এর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। বলল, আর তোমরা কী জানো, বৃত্ত ৩৬০ ডিগ্রি কেন?

সবাই মাথা নাড়ল, কেউই জানে না। তৃৰ্য বলল, এটার দুই রকম

ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, দুটোই ব্যাবিলনীয়দের এই ৬০ ভিত্তিক সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে।



বলা হয় যে সুমার অঞ্চলের মানুষেরাই প্রথম আবিষ্কার করেছিল কীভাবে লিখতে হয়। সেটা পরবর্তীতে ব্যাবিলনের সভ্যতার মাঝেও চলে এসেছে। সেই প্রাচীন ব্যাবিলনের একটা কাদামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয় ১৯৫০ সালের দিকে। সেখানে দেখা যায় তারা হিসাব করে দেখিয়েছে একটা বৃত্তের পরিধি আর এর মাঝে একটা ষড়ভুজ আঁকা, তাহলে তার পরিসীমার অনুপাত হবে  $\frac{6}{12} + \frac{60}{360}$ । তো সম ষড়ভুজকে ছয়টা সমবাহু ত্রিভুজে ভাগ করা যায়। ধারণা করা হয়, সমবাহু ত্রিভুজের একেকটা কোণকে ওরা ৬০ ডিগ্রি করে ভেবেছে। এটাকে কোণ মাপার একক চিন্তা করেছে। এরপর ৬টা সমবাহু ত্রিভুজ মিলে একটা ষড়ভুজ। একটা ষড়ভুজে কেন্দ্রে সবকোণ মিলে হবে  $6 \times 60 = 360$  ডিগ্রি।

আবার আরেকটা ব্যাখ্যা হলো চাঁদ-সূর্যের হিসাব।

তোমরা সবাই ইংরেজি Month শব্দটা জানো। th দিয়ে সাধারণত Noun বোঝায়, Noun-এর Suffix এটা। আর Mon অংশটি আসলে Moon-এর সাথে সম্পর্কিত। আমরা জানি Monday বলে একটা ব্যাপার আছে, আমরা বাংলায় বলি সোমবার— বাংলায় সোম শব্দটির অর্থও কিন্তু চাঁদ।

তো যা-ই হোক এই Month শব্দটির সাথে চাঁদের একটি সম্পর্ক আছে এবং ব্যাবিলনের জ্যোতির্বিদেরা খেয়াল করেছিলেন যে চাঁদ একটা দশা থেকে আর একটা দশায় ফিরে আসতে মোটামুটি ৩০ দিনের মতো লাগে। মনে করো, একটা পূর্ণিমা থেকে আবার ঘুরে ঘুরে পূর্ণিমা হলো। এটা হতে মোটামুটি সময় লাগে ৩০ দিনের মতো। এই ৩০ দিন সময়টাকে তারা একটা নাম দিয়েছিল ১ মাস বা 1 Month।

এখন আমরা জানি যে এটা আসলে ঠিক ৩০ দিন না। এটা ২৯.৫ দিনের মত। তখনকার দিনের মানুষের হিসাবে ছিল এটা ৩০ দিন।

এবং তারপর তারা খেয়াল করেছিল একটা ঝুতু আবার একটা ঝুতু ফিরে আসতে প্রায় ১২ মাসের মত সময় লাগে। সে সময় তারা কিন্তু জানত পৃথিবীর চারপাশে সূর্য ঘোরে। তার মানে তারা ভেবেছিল সূর্যটা পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে আসতে সময় লাগে ১২ মাসের মত। এটা একটা চঞ্চের মতো। ৩০ দিনে মাস, ১২ মাসে বছর। তাহলে বছরের চক্র হয়  $12 \times 30 = ৩৬০$  দিনে। বছর যে আসলে ৩৬৫ দিনে হয়, সেটা তখনো ওরা জানত না। তবু জ্যোতির্বিদ্যার কোনো রকম আধুনিক জ্ঞান কিংবা যন্ত্রপাতি ছাড়াই ওরা যে ৩৬০ দিনে একটা চক্র হিসাব করেছিল, সেটা কিন্তু যথেষ্ট কাছাকাছি।

এই চক্রকে জ্যামিতিকভাবে অঁকার উপায় ছিল বৃত্ত দিয়ে বোঝানো। ফলে বছরকে ভাবল বৃত্ত, একেকটা দিন তার একেকটা ভাগ। তাই বৃত্তটাকে ওরা ৩৬০ ভাগে ভাগ করেছিল। অনেক পরে ওটার নাম দেওয়া হয় ডিগ্রি।

**শূন্য ধনাত্মক না কি ঋণাত্মক?** বৃত্ত দেখতে দেখতে শূন্যের কথা মনে পড়ে বান্টির, শূন্য নিয়ে ওর কিছু সংশয় আছে। ও তৃষ্ণকে প্রশ্ন করে, ভাইয়া, একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। আচ্ছা ভাইয়া, এই যে শূন্য, এটা কি ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক?

তৃষ্ণ একটু ঘুরিয়ে বলল, চিহ্ন অনুসারে বাস্তব সংখ্যা তিন প্রকার—ধনাত্মক, শূন্য ও ঋণাত্মক।

ও, তার মানে এটা ধনাত্মকও না, ঋণাত্মকও না?

ঠিক তাই। শূন্য একাই একটা প্রকার। অঋণাত্মকের মাঝে রাখতে পারো। অধনাত্মকের ভেতরেও রাখতে পারো!

**শূন্য জোড় না কি বিজোড়?** এবার একটু সাহস হলো টিনার, আর ভাইয়া, ০ কি জোড় না বিজোড়? হুমায়ুন আহমেদের এক নাটকে দেখেছিলাম, এক মাস্টার বলে শূন্য হলো বিজোড়।

বলো কী, কোন নাটকে? আচ্ছা সেটা ব্যাপার না। আসল কথা হলো শূন্য একটা জোড় সংখ্যা। জোড় কারা সেটা ভাবো, যাদের দুই দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা যায়। শূন্যকে দুই দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা যায়।

কল্পনা করতে পারো এভাবে, শূন্যটা আপেল দুজনকে সমানভাবে ভাগ করে দিলে। দুজনেরই থাকল শূন্যটা করে আপেল!

কিন্তু ভাইয়া, শূন্য তো ১ দিয়েও বিভাজ্য, ৩ দিয়েও বিভাজ্য। তাহলে কি সেদিক থেকে দেখলে এটা বিজোড়?

তৃষ্ণ পরিষ্কার করল, নাহ। জোড়া বা parity-র হিসাব হয় দুটো দুটো করে। এক জোড়া স্যান্ডেল মানে ঠিক দুইটা স্যান্ডেল, একটাও না, তিনটাও না। তাই এখানে দুই ব্যাপারটা দরকারি। জোড়, বিজোড় নির্ধারণে আর কোনো সংখ্যা নয়; বরং দুই দিয়ে নিঃশেষে ভাগ যায় কি না, সেটাই মুখ্য। অন্য কিছু দিয়ে নিঃশেষে ভাগ গেল কি গেল না, ব্যাপার না।

আরও অনেকভাবে শূন্য যে জোড় সেই বাপারটাকে অনুভব করা যায়— পূর্ণসংখ্যাগুলোর দিকে তাকাও। ১, ২, ৩, ৪....। এখানে দেখবে একটা জোড়, একটা বিজোড়। উল্টো করে দেখো ও বিজোড়, ২ জোড়, ১ বিজোড়, তাহলে এর আগেরটা মানে শূন্য হবে জোড়, শূন্য এর আগে -১ বিজোড়, -২ জোড়।

পৃথী বলল, ও, ঋণাত্মক সংখ্যারও যে জোড়-বিজোড় হয়, জানতাম না। তৃষ্ণ হাসল, হ্যাঁ, হয়!

তবী এবার বলল, শূন্যের একটা ব্যাপার আমি বুঝি না। আমার শুধু মনে হয়, কোনো কিছুকে ০ দিয়ে

**শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কেন ওই সংখ্যাটাই পাওয়া যায় না?**

ভাগ করলে তো ওই সংখ্যাটাই আসা উচিত! কোনো সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করা মানে সংখ্যাটাকে দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে ০ দিয়ে ভাগ মানে বোঝায় ওই সংখ্যাকে ভাগই করা হয়নি। ভাগ যদি না-ই করা হয় তাহলে যা ছিল তা-ই থাকবে। এই চিন্তায় ভুল কই?

তৃষ্ণ বলল, আমিও তো এভাবে ভাবি নাই কখনো! আসলে পড়াতে গেলে এ রকম দারুণ সব প্রশ্ন পাওয়া যায়! তোমরা যা শেখো, তার থেকে আমিই বেশি শিখি। যাহোক, তোমার প্রশ্নে আসি। এখানে চিন্তার একটা ব্যাপার আছে। ধরো, তোমার কাছে ১২ টাকা আছে। এটা তুমি

New Pdf Book download: [www.PoragEducation.com](http://www.PoragEducation.com)  
তুম চুস করে বলে দেবে, প্রত্যেকে চারটে করে পাবে? এটাকে আমরা বলছি  $12 \text{ ভাগ } 3 = 4$ ।

খেয়াল করো, তোমার কাছে কী আছে, সেটা কিন্তু ভাগফল না। যাদের দিচ্ছ, তারা প্রত্যেকে কত করে পাচ্ছে সেটা ভাগফল। তুমি যদি ওই ১২ টাকা ২ জনকে দাও, তাহলে ওই দুজনের প্রত্যেকের কাছে ৬ টাকা থাকল।  $12 \div 2 = 6$ । ব্যাপারটা অনেকটা এ রকম যে তুমি টাকাটা ঠিকমতো বিতরণ করছ কি না, সেটা তোমার থেকে খোঁজ নেওয়া হবে না, যাদের দিচ্ছ তাদের থেকে খোঁজ নেওয়া হবে। এখন তুমি শূন্যজনকে ভাগ করে দাও, মানে কাউকে দিলে না। এবারে আমি খোঁজ নিতে গেলাম তাদের কাছে, যারা টাকাটা পেয়েছে। তুমি যেহেতু কাউকে দাওইনি, আমি কার থেকে খোঁজ নেব? ‘প্রত্যেকে কত করে পেয়েছে’ এই প্রশ্নটা তখন কোনো অর্থ বহন করবে না।  $12 \div 0$  অসংজ্ঞায়িত।

**শূন্য দিয়ে ভাগ করার আরেক সমস্যা** মনে করো, একটা বালতিতে ১২ লিটার পানি আটে। আর একটা মগে ৩ লিটার পানি আটে। তাহলে মগ দিয়ে সব পানি তুলে ফেলতে চাইলে ৪ বার তুলতে হবে।  $12 \text{ ভাগ } 3 = 4$ । ভাগকে এভাবে বোঝার চেষ্টা করি।

ঠিক একইভাবে, বালতিতে যদি ১২ লিটার পানি আটে আর মগে ২ লিটার, তাহলে সব পানি ওঠাতে চাইলে পানি তুলতে হবে  $12 \text{ ভাগ } 2 = 6$  বার।

এবার ভাবো, বালতিতে যদি ১২ লিটার পানি থাকে, আর মগে যদি পানিই না আটে (মগের তলা পুরো ফাঁকা!) অর্থাৎ মগে যদি ০ লিটার পানি আটে, তাহলে ওই মগ দিয়ে সব পানি ওঠাতে চাইলে পানি তুলতে হবে কত বার?  $12 \text{ ভাগ } 0$  বার!!

অমন মগে কি আদৌ পানি ওঠানো যাবে? যাবে না! এবং  $12 \text{ ভাগ } 0$ -এর মানও পাওয়া যাবে না। সবার চোখ দেখে মনে হলো এবার

তারা কিছুটা বুঝেছে।

চিনা বলল, ভাইয়া, ভাগ নিয়ে যখন বলছেন, এখানে আমার একটা জিনিস জানার ছিল। ভাগ নাকি বিয়োগের সংক্ষিপ্ত রূপ! এটা কীভাবে? তৃষ্ণ বলল, আচ্ছা, আবার চলো মগ আর বালতির কাছে যাই। আগের ঘতই মনে করো, একটা বালতিতে ১২ লিটার পানি আটে। আর একটা মগে ৩ লিটার পানি আটে। তাহলে মগ দিয়ে সব পানি তুলে ফেলতে চাইলে কতবার তুলতে হবে? ৪ বার। এটাকে ভাগ দিয়ে ভাবতে পারো। বিয়োগ দিয়েও ভাবতে পারো।  $12$  লিটার থেকে প্রথমে  $3$  লিটার তুললে, থাকল  $12 - 3 = 9$ ; এই  $9$  লিটার থেকে  $3$  লিটার তুললে, থাকল  $9 - 3 = 6$ ; সেই ছয় থেকে তিন তুললে, থাকল  $6 - 3 = 3$ . সেই ৩ থেকে ৩ তুললে, থাকল ০, সব পানি শেষ। তার মানে  $12$  থেকে  $3$  বিয়োগ দিয়ে শূন্য বানাতে হলে কতবার বিয়োগ করতে হবে? চারবার। এটাই  $12 \div 3 = 4$ ; তবে এখানে বলে রাখি যোগ থেকে গুণ বা বিয়োগ থেকে ভাগের এই ধারণাগুলো শুরুর জন্য ভালো, কিন্তু জটিল সংখ্যা, অমূলদ সংখ্যা—এসব ক্ষেত্রে সরাসরি এই চিনাগুলো আর কাজ করে না। তখন নতুন করে ভাবতে শিখতে হয়! সেটাও সময় পেলে তোমাদের বলব।

চিনা বলল, ভাইয়া, কত রকমের সংখ্যার নাম বললেন। আমি **ঝণাঝুক সংখ্যার কী দরকার ছিল?** তো ধনাঝুক-ঝণাঝুক সংখ্যার মতো সহজ ব্যাপারগুলোই গোলমাল পাকিয়ে ফেলি। শুধু মনে হয়, এই ঝণাঝুক সংখ্যার কি আদৌ কোনো দরকার আছে? মানে আমরা তো কখনো বলি না যে -১টি পেনসিল বা -২টি কমলা। তাহলে ঝণাঝুক সংখ্যার বাস্তব উদাহারণ কী হতে পারে?

তৃষ্ণ হেসে বলল, আমার ব্যাংক ব্যালান্স! আমার একটা অ্যাকাউন্টে ৩০ টাকা ছিল। জানতাম না যে ওখানে মাসিক ১০০ টাকা সার্ভিস চার্জ কেটে রাখে। হায় কপাল, মাস শেষে দেখলাম ব্যালান্স -৭০ টাকা, হা হা হা।

হাসল সবাই। কিন্তু টাকাপয়সা ছাড়া আর কোথাও কী কাজে লাগে? এখন গুগলে খুঁজে দেখতে পারো এভারেষ্টের চূড়ায় তাপমাত্রা কত!

পাবে -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তারও কম! এই তাপমাত্রা ঝণাভুক  
এবং বাস্তব!

বাংলাদেশে ২০১৬-তে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.১%, মানে  
জনসংখ্যা বাঢ়ছে! জাপানে সেটা -০.১% মানে জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে!  
এই ঝণাভুক সংখ্যাটা ওদের বিরাট বাস্তব সমস্যা!

এগুলো সামান্য উদাহরণ মাত্র! মূল ব্যাপারটা হলো ‘আদর্শ বা মূলবিন্দু’!  
পৃথিবীতে কোনো হিসাবই পরম হিসাব না! কোনো একটাকে মূল ধরে  
তার সাপেক্ষে সবকিছু আমরা হিসাব করি! পানির হিমাঙ্ককে ০ ডিগ্রি  
সেলসিয়াস বা আদর্শ ধরে নিলে তার চেয়ে বেশিগুলোকে ঝণাভুক আর  
তার থেকে ছোটগুলোকে ঝণাভুক বলি আমরা! হিমাঙ্ককে ০ ধরি, তখন  
স্ফুটনাঙ্ক হয় ১০০ ডিগ্রি। আমরা চাইলে পানির স্ফুটনাঙ্ককেও ০ ধরতে  
পারতাম, তখন পানির হিমাঙ্ক হতো -১০০ ডিগ্রি! ঝণাভুক সংখ্যার  
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, এটা আমাদের যেকোনো জায়গাকে  
মূলবিন্দু ভাবার এই স্বাধীনতাটা দেয়।

টিনা বুঝতে পারল, ঝণাভুক সংখ্যার আসলে দরকার আছে। পৃথী  
অবাক হয়ে শুনছিল, ওর মনে পড়ল, ফ্লাসে একবার নজিবুল্লাহ স্যার  
একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ১৫ আর -১২ এর লসাগু কত, বলাই  
বাহুল্য ছেলেটা পারেনি। আশ্চর্য কথা হলো স্যার শুধু জিজ্ঞেস করেই

খালাস, উত্তরটা আর বুঝিয়ে দেননি।

এখন সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করল  
তুর্যকে। ভাইয়া, ঝণাভুক সংখ্যার লসাগু  
গসাগু কেমন হয়?

সবাই এক ঝটকায় তাকাল পৃথীর দিকে, সবার মনে পড়ে গেছে  
নজিবুল্লাহ স্যারের ওই দিনের ঘটনার কথা। এখানে কেন তার কথা  
মনে করিস! বিরক্তি সামলে পৃথী বলল, আর ভাইয়া, যদি কোনো একটা  
সংখ্যা শূন্য হয়, তখন লসাগু গসাগু কেমন হয়?

তুর্য বলল, তোমাদের নজিবুল্লাহ মাস্টার চরিত্রটা ইন্টারেষ্টিং! যাহোক,  
তোমাদের প্রশ্নে আসি। এটা নিয়ে ছোটবেলায় আমার নিজেরও দ্বিধা

ছিল, এখন নেই। ঝণাভুকের ক্ষেত্রে মূল কথা হলো, মাইনাস চিহ্ন বাদ  
দিয়ে ভাববে— বাস, বামেলা শেষ!

ধরো, তোমায় কেউ জিজ্ঞেস করল ১২ এবং -১৬-এর লসাগু বা গসাগু  
কত? ১৬-এর আগের ঝণাভুক চিহ্ন দেখে মোটেই ঘাবড়ে যাবে না।  
জেনে রেখো, লসাগু বা গসাগু এমনভাবে সংজ্ঞায়িত যে, এরা কখনো  
ঝণাভুক হয় না। ঝণাভুক চিহ্নটা বাদ দিয়ে চিন্তা করলেই চলবে। মানে  
ঝণাভুক হয় না। ঝণাভুক চিহ্নটা বাদ দিয়ে চিন্তা করলেই চলবে।  
হলো ১২ আর ১৬-এর গসাগু যা, ১২ আর -১৬-এর গসাগুও তাই, -১২  
আর ১৬-এর গসাগুও একই, -১২ আর -১৬-এর গসাগুও ওই একই।  
এদের সবারই গসাগু ৪। লসাগুর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একইরকম。  
সবক্ষেত্রেই লসাগু হবে ৪৮। ঝণাভুক চিহ্ন বাদ দিয়ে ভাবলেই বামেলা  
শেষ।

কেন, ভাইয়া?

বোঝাচ্ছি। প্রথমে গসাগু বা গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়কের কথা ভাবো।  
দেখো, ১২-এর গুণনীয়কগুলো অর্থাৎ যেসব পূর্ণসংখ্যা দিয়ে ১২ নিঃশেষে  
বিভাজ্য তারা হলো ১, ২, ৩, ৪, ৬, ১২। কিন্তু ১২ সংখ্যাটা তো -১,  
-২, -৩ এই সব দিয়েও বিভাজ্য। তাই যদি ঝণাভুক সংখ্যাদেরও  
রাখতে চাও তাহলে বলতে পারো ১২-এর গুণনীয়কগুলো হলো ±১,  
±২, ±৩, ±৪, ±৬, ±১২। খেয়াল করে দেখো, -১২-এর গুণনীয়কও  
কিন্তু এরাই!

এভাবে ১৬ বা -১৬-এর গুণনীয়কগুলো হলো ±১, ±২, ±৪, ±৮, ±১৬।  
দুটোর ভেতরে যারা কমন বা সাধারণ তারা হলো ±১, ±২, ±৪। এদের  
মধ্যে গরিষ্ঠ বা সবচেয়ে বড় হলো ৪, তাই গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক  
হলো ৪। ঝণাভুক চিহ্ন এখানে কোন ভূমিকা রাখে না।

লসাগুর ক্ষেত্রে সামান্য বামেলা আছে, কিন্তু সেটা এড়ানো যায়। আগের  
মতোই লক্ষ করো, ১২-এর গুণিতক যারা, -১২-এর গুণিতকও তারাই।  
০, ±১২, ±২৪, ±৩৬, ±৪৮, ±৬০, ±৭২, ±৯৬ এমন করে অসীম  
সংখ্যক গুণিতক এদের আছে। অন্যদিকে ১৬ বা -১৬-এর গুণিতক হবে  
০, ±১৬, ±৩২, ±৪৮, ±৬৪, ±৮০, ±৯৬ এমন করে অনেকে। তো

১ আর  $\pm 6$ -এর গুণিতকদের ভেতরে কমন বা সাধারণ আছে কারা?  $0, \pm 8, \pm 9$  ইত্যাদি। এদের মধ্যে লঘিষ্ট কে?

ঝগাড়ককে নিতে গেলে বিপদ, কারণ  $-8$ -এর চেয়ে  $-9$  ছোট। আরও পেছনে গেলে  $-144$  পাওয়া যাবে যা  $16$  এবং  $12$  দুইয়েরই গুণিতক। সেটা  $-96$ -এর চেয়েও ছোট। আরও বামে গেলে  $-192$  পাওয়া যাবে, সেটা আরও ছোট, এমন করে আরও ছোট সাধারণ গুণিতক আমরা পেতেই থাকব। সব থেকে ছোট যে কোনটা, তার কোনো কূল-কিনারা পাওয়া যাবে না। আবার দুটো অশূন্য সংখ্যার লসাঙ্গ শূন্য হলে বামেলা, তাহলে দুনিয়ার সব লসাঙ্গের মান হবে  $0$ । কারণ শূন্য তো সবার গুণিতক, সব জায়গাতেই থাকবে। তাই লসাঙ্গকে সুসংজ্ঞায়িত করার জন্য, সাধারণ গুণিতকগুলোর ভেতরে সব থেকে ছোট ‘ধনাড়ক’ মানটাকে লসাঙ্গ ধরা হবে। যেমন এ ক্ষেত্রে লসাঙ্গ হলো  $48$ ।

### একটা সংখ্যা শূন্য থাকলে লসাঙ্গ গসাঙ্গ কেমন হয়?

ধরো আমরা  $-6$  ও  $0$ -এর লসাঙ্গ বের করতে চাই।  $-6$ -এর গুণিতক কারা?  $0, \pm 6, \pm 12, \pm 24$  এমন করে অনেকে। আর  $0$  এর গুণিতক কারা?  $0$  এর ঘরের নামতা ভাবো।  $0$  একে  $0, 0$  দুগুণে  $0, 0$  তিরিক্তে  $0$ । তার মানে  $0$  এর গুণিতক আছেই একটা, সেটা হলো  $0$ । তাই  $6$  আর  $0$  এর গুণিতকদের ভেতরে কমন আছে একটা, সেটা হলো  $0$ । এখন কথা হলো পরিবারে একটামাত্র ছেলে থাকলে, সে-ই পরিবারের সবচেয়ে ‘বড় ছেলে’, সে-ই সবচেয়ে ছোট। তাই  $-6$  ও  $0$ -এর লঘিষ্ট সাধারণ গুণিতক হবে  $0$ ।

গসাঙ্গের ক্ষেত্রে কী হবে? যদি দুটো সংখ্যার মধ্যে একটা  $0$  (শূন্য) হয়, তাহলে গসাঙ্গ হবে  $0$  বাদে বাকি সংখ্যাটার পরমমান। এটাও সহজে ভাবা যায়। ধরো,  $-6$  ও  $0$ -এর গসাঙ্গ বের করতে চাই।  $6$  বা  $-6$ -এর গুণনীয়ক হলো  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ । অন্যদিকে  $0$  এর গুণনীয়ক তো শূন্য বাদে দুনিয়ার সব পূর্ণসংখ্যা:  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6$ ,

$\pm 7\dots$ । এদের ভেতরে কমন বা সাধারণ হলো  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ । তাহলে  $0$  আর  $-6$ -এর সাধারণ গুণনীয়কদের ভেতরে সবচেয়ে বড় বা গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক হবে  $6$ । অর্থাৎ মানে  $0$  বাদে বাকি সংখ্যাটার পরমমান।

দুটো সংখ্যাই যদি শূন্য হয়, লসাঙ্গও  $0$ , গসাঙ্গও  $0$ ।

গসাঙ্গকে ইংরেজিতে GCD (Greatest Common Divisor) বলে, আর লসাঙ্গকে বলে LCM (Least Common Multiple)। ধরো  $a, b$  দুটো পূর্ণসংখ্যা। এদের গসাঙ্গকে লেখা যায়  $GCD(a, b)$ , আর লসাঙ্গকে লেখা যায়  $LCM(a, b)$  এতক্ষণ যা বললাম, তার সারমর্ম এভাবে লেখা যায়—

$$GCD(a,b)=GCD(|a|,|b|)$$

$$GCD(a,0)=|a|$$

$$GCD(0,0)=0$$

$$LCM(a,b)=LCM(|a|,|b|)$$

$$LCM(a,0)=0$$

$$LCM(0,0)=0$$

আরেকটা ব্যাপার তোমরা হয়তো শনেছ, দুটো সংখ্যার লসাঙ্গ ও গসাঙ্গের গুণফল সংখ্যা দুটোর গুণফলের সমান হয়। ঝগাড়ক সংখ্যা চিন্তা করলে বলা উচিত লসাঙ্গ-গসাঙ্গের গুণফল সংখ্যা দুটোর গুণফলের ‘পরমমানের’ সমান হয়

$$GCD(a,b) \times LCM(a,b) = |ab|$$

টিনা জিজেস করল, ভাইয়া,  $0$  এবং  $0$  আর  $0$ -এর গসাঙ্গের ক্ষেত্রে  $0$ -এর গসাঙ্গ কেন  $0$  হবে?

আমেলা কোথায়?

এটা আসলেই একটা চিন্তার বিষয়। যেহেতু সব পূর্ণসংখ্যা দিয়েই শূন্যকে নিঃশেষে ভাগ করা যায়,  $0$  এর গুণনীয়ক হবে সব পূর্ণসংখ্যা:  $1, -1, 2, -2, 3, -3\dots$  ইত্যাদি। দুটো সংখ্যাই যদি  $0$  হয়, তখন কমনও থাকবে সবগুলো। মানে সাধারণ গুণনীয়কও হবে সব পূর্ণসংখ্যা। এদের ভেতরে গরিষ্ঠ নিতে গেলে আমরা কোনটা নেব? তখন অসীমের

মতো unbounded একটা মান পাব।

এ রকম ক্ষেত্রগুলোতে যেটা করা হয় তা হলো, ভিন্নভাবে চিন্তা করে এমন কোনো মান ঠিক করে দেওয়া হয়, যেন অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ঠিক থাকে। যেমন গসাগুর একটা বৈশিষ্ট্য হলো  $\text{GCD}(ma, mb) = |m| \cdot \text{GCD}(a, b)$ ; অর্থাৎ দুটো সংখ্যাকে  $m$  গুণ বাড়ালে এদের গসাগুর  $m$  গুণ হয়ে যাবে, যেখানে  $m$  পূর্ণসংখ্যা। যেমন  $\text{GCD}(3 \times 5, 6 \times 5) = 5 \times \text{GCD}(3, 6)$ । এখন এখানে  $m$ -এর মান যদি 0 চিন্তা করা যায়, আমরা পাব  $\text{GCD}(0 \times a, 0 \times b) = 0 \times \text{GCD}(a, b)$ , বা  $\text{GCD}(0, 0) = 0$ । অর্থাৎ শূন্য এবং শূন্যের গসাগুর হলো শূন্য।

আরেকটা বৈশিষ্ট্য আমরা একটু আগে দেখেছি,  $\text{GCD}(a, 0) = |a|$ , এখানেও  $a$ -এর মান শূন্য হলে পাব—  $\text{GCD}(0, 0) = 0$ ।  $\text{GCD}(0, 0)$ -এর আর কোনো মানের জন্য এই বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিক থাকবে না। এ জন্য সংজ্ঞাতেই  $\text{GCD}(0, 0) = 0$  ধরে নেওয়া হয়।

**চিনা একটু কাচুমাচু করে বলল,  
লসাগুর মূল ঘটনাটা কী? ভাইয়া, লসাগুর ব্যাখ্যাটা আবার একটু  
বোঝাবেন...।**

তৃৰ্য বলল, অবশ্যই। আমি খুব খুশি হয়েছি তুমি যে আবার জিজ্ঞেস করেছ। আমি যা বলছি তার সব কথা তুমি বুঝবেই এটা আমি আশা করি না। না না, এটা তোমার দুর্বলতা না। আমি হয়তো সেভাবে উপস্থাপন করতে পারিনি, যেভাবে বললে তুমি বুঝতে।

১৬ আর -১২-এর কথা আবার ভাবো! এদের সাধারণ গুণিতক হলো ০, ৪৮, -৪৮, ৯৬, -৯৬, ১৪৪, -১৪৪, ১৯২, -১৯২ এমন করে চলতেই থাকবে! এখন এদের ভেতরে সবচেয়ে ছোট কে?

চিনা বলল, -১৯২।

গুড়। এখন খেয়াল করো, আমি বলেছি ‘এমন করে চলতেই থাকবে’, তার মানে -১৯২তেই শেষ নয়। আরও পেছালে -২৪০ পাবে, সেটা ও ১৬ এবং -১২-এর গুণিতক। আরও পেছালে -২৮৮ পাবে, আরও গেলে -৩৩৬ পাবে। তারাও ১৬ এবং -১২-এর গুণিতক। এমন করে আমরা

অনন্তকাল ধরে পেছাতে পারব। তাহলে সবচেয়ে ছোট কে, সেটা কি এ ক্ষেত্রে বলা সম্ভব? না। সে ক্ষেত্রে সাধারণ গুণিতকদের ভেতরে (০ বাদে বাকিদের ভেতরে) যার পরমমান সবচেয়ে ছোট, তাকেই লসাগু হিসেবে নেওয়া হয়।

তবে লসাগু জিনিসটা কী, সেটাই চলো আরও ভালো করে বোঝাই। লসাগু কেন করছি আমরা? আমরা আসলে কী বের করতে চাই? একটা উদাহরণ দিই। ধরো, একটা ঘড়ি এমনভাবে সেট করা যেন সেটা ১২ মিনিট পরপর অ্যালার্ম দেয়। আরেকটা ঘড়ি ১৬ মিনিট পরপর অ্যালার্ম দেয়। তুমি একবার খেয়াল করলে তারা একসাথে অ্যালার্ম দিল। এখন দেয়। তুমি কি বলতে পারবে আবার কখন তারা একসাথে অ্যালার্ম দেবে?

প্রথম ঘড়ি এরপর ১২ মিনিটে, তারপর ৩৬, তারপর ৪৮, তারপর ৬০ মিনিটে অ্যালার্ম দেবে, এভাবে প্রতি ১২ মিনিট পরপর অ্যালার্ম দিতেই থাকবে। দ্বিতীয়টা এরপর ১৬, তারপর ৩২, তারপর ৪৮, তারপর ৬৪ তে অ্যালার্ম দেবে, এভাবে প্রতি ১৬ মিনিট পরপর অ্যালার্ম দিতেই থাকবে।

খেয়াল করো, দুইটাই একসাথে অ্যালার্ম দেবে ৪৮-এ গিয়ে। তাহলে তখন থেকে যদি আবার ভাবি নিশ্চয়ই আরও ৪৮ মিনিট পরে তারা আবার একসাথে অ্যালার্ম দেবে। তার মানে যখন তুমি ওদের একসাথে বাজতে দেখেছ, সেই শুরুর সময়ের ৪৮ মিনিটে একসাথে একবার বাজতে দেখেছে, সেই ৪৮ মিনিটে, তারপর আরও ৪৮ মিনিট পর, মানে ১৪৪ দেবে, তারপর ১৯২ মিনিটে, তারপর ২৪০-এ, ২৮৮-এ, এভাবে মিনিটে। এরপর ১৯২ মিনিটে, তারপর ২৪০-এ, ২৮৮-এ, এভাবে প্রতি ৪৮ মিনিট পরপর ওরা একসাথে বাজতে থাকবে (আশা করি ব্যাটারি টিকে থাকবে কিংবা সোলার প্যানেল বসানো ভাবতে পারো)। ভালো করে দেখো, যে সংখ্যাগুলো দেখছ এরা সবাই আসলে ৪৮-এর গুণিতক বা ৪৮-এর ঘরের নামতা। ৪৮-কে জানলেই এদের সবাইকে জানা যায়।

এবার ধরো, তুমি উল্টো করে ভাবছ। তুমি দেখলে এখন একবার একসাথে বাজল, তাহলে বলো তো এর আগে কখন একসাথে বেজেছিল? নিশ্চয়ই ৪৮ মিনিট আগে। শুরুর সময়কে ০ ধরলে ৪৮

মিনিট আগের সময়টাকে তুমি বলতে পারো -৪৮ মি। তাহলে তার আগে কখন বেজেছিল? -১৯৬-এ, তার আগে -১৪৪-এ...। ভালো করে দেখো এরাও কিন্তু ৪৮-এর গুণিতক। এবারে ফিল করার চেষ্টা করো, এই আলোচনায় ৪৮, ৯৬, ১৪৪, ১৯২ কিংবা -৪৮, -৯৬, -১৪৪, -১৯২ -এদের ভেতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা কোনটা? কোন সংখ্যাটাকে জানলে তুমি বাকি সব সংখ্যা বের করে নিতে পারবে। কতক্ষণ পরপর ওরা একসাথে বাজে? কতক্ষণ আগে ওরা একসাথে বেজেছিল? বলো দেখি সেটা কত?

টিনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবার। ও বলল, '৪৮'।

ঠিক তা-ই। এ জন্য ৪৮-কে লসান্ড বললে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই।

**ভাইয়া, গসান্ডুর কথায় মনে পড়ল, আমাদের সহমৌলিক সংখ্যা কী?** বইয়ে এক জায়গায় আছে গসান্ডু ১ হলে সহমৌলিক বলে। ১-কে সহমৌলিক কেন বলল?

তৃৰ্য বলল, না, না, ১ কে সহমৌলিক বলা হয় না! সহমৌলিক বা Coprime ব্যাপারটার জন্য দুইটা সংখ্যা লাগে! দুটো সংখ্যার গসান্ডু যদি ১ হয়, ওই দুটো সংখ্যা পরম্পর সহমৌলিক। যেমন ৫ আর ১২ সহমৌলিক! ৩ আর ৮ সহমৌলিক! সহমৌলিক হওয়া মানে সংখ্যা দুটোর ভেতরে ১ ছাড়া আর কোনো সাধারণ গুণনীয়ক নেই! ১-এর সাথে সব পূর্ণসংখ্যাই সহমৌলিক। কারণ ১-এর সাথে সবার গসান্ডু ১।

**মৌলিক সংখ্যা কী?** তবীকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল, ১ সবার সাথে সহমৌলিক, কিন্তু ১ নিজে কি মৌলিক সংখ্যা?

তৃৰ্য জোর দিয়ে জানাল, না, সহমৌলিক হওয়ার সাথে মৌলিক হওয়ার কোনো সম্পর্ক নাই। এবং তুমি শতভাগ ঠিক আছ— ১ কোনো মৌলিক সংখ্যা নয়। মৌলিক সংখ্যার সংজ্ঞাতেই বলে দেওয়া আছে মৌলিক সংখ্যা হবে ১-এর থেকে বড় পূর্ণসংখ্যা। আর তাদের উৎপাদক থাকবে দুইটা ১ এবং সেই সংখ্যা নিজেই। ১কে যদিও আর ভাঙা যায় না, তবু ১কে মৌলিক সংখ্যা কি? ১-কে মৌলিক সংখ্যার ভেতরে রাখা হয়নি।

টিনার মনে হলো ১-এর জন্য খুব করণা হচ্ছে, আহারে, ১-কে বাদ দিল কেন?

বান্টি ফিচকে হাসি দিল, নিশ্চয়ই ১-এর কোনো টাল্টি-বাল্টির ইতিহাস আছে!

ভাইয়াও হাসল, কথা খানিকটা সত্যি। ১-এর ঝামেলা আছে। মৌলিক সংখ্যার কী দরকার সেটা আগে বোঝো, তাহলে বোঝা সহজ হবে কেন সংখ্যার মধ্য থেকে বাদ দেওয়া হলো। ১-কে মৌলিক সংখ্যার মধ্য থেকে বাদ দেওয়া হলো।

বলো, রসায়নে পানির সংকেত কী?  $H_2O$ । দেখো, এটার ভেতর দুইটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। কী কী মৌল আছে, আর প্রতিটা মৌল কতগুলো করে আছে। এদের কোনো একটা তথ্য বদলে গেলে এটা আর পানি থাকবে না। এই দেখো, H-এর মধ্যের ছোট অনুভূমিক দাগটাকে থাকবে না। আবার  $N_2O$ -এর অক্সিজেন একটা বাড়িয়ে অ্যাটাক করে মরে যাবে। আবার  $H_2O$ -এর অক্সিজেন একটা বাড়িয়ে দিলে হয়ে যাবে  $H_2O_2$ , হাইড্রোজেন পার অক্সাইড।  $H_2O$ -তে কাপড় দিলে হয়ে যাবে  $H_2O_2$ , হাইড্রোজেন পার অক্সাইড। তাই আবার পরিষ্কার হয় আর  $H_2O$ , দিলে রংটং উঠে কাপড় নষ্ট হয়। তাই আবার দুটো তথ্যই খুব জরুরি।

এবার সংখ্যার ভেতরে ভাবো। ধরো ৪৫ সংখ্যাটার ভেতরে মৌলিক কারা আছে, তুমি বের করতে চাও। দেখবে একে দুইবার ৩ দিয়ে ভাগ করা যায় আর একবার ৫ দিয়ে।  $45 = 3 \times 5$ । এর ভেতরে দুইটা ৩ আছে আর একটা ৫। খেয়াল করো, ৪৫-কে কিন্তু আর কোনো মৌলিক আছে আর একটা ৫। যেভাবেই মানুষ বের করতে চাক এখানে সংখ্যা দিয়ে লেখা যায় না। যেভাবেই মানুষ বের করতে চাক এখানে ঠিক দুইটাই ৩ পাবে এবং একটাই ৫ পাবে। এভাবে লেখাকে বলে মৌলিক সংখ্যার সূচকের গুণফল আকারে প্রকাশ বা prime power factorization।

সংখ্যাত্বের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা উপপাদ্য হলো, কোনো পূর্ণসংখ্যাকে অনন্য উপায়ে মানে শুধু একভাবে মৌলিক সংখ্যার সূচকের গুণফল আকারে লেখা যাবে। এটাকে বলে পাটিগণিতের মূল উপপাদ্য বা

Fundamental Theorem of Arithmatic। এই উপপাদ্যকে ব্যবহার করে আরও অজস্ত্র উপপাদ্য প্রমাণ করা হয়েছে। এখন যদি ১-কে মৌলিক ধরা হয়, তাহলে এই যে বললাম ‘শুধু একভাবে’ প্রকাশ করা যায়— সেই ব্যাপারটা আর ঠিক থাকে না।

কেউ লিখবে  $85 = 1^2 \times 3^2 \times 5$ । কেউ লিখতে পারে  $85 = 1^0 \times 3^2 \times 5$ , কেউ লিখতে পারে,  $1^{10000} \times 3^2 \times 5$ । সব ক্ষেত্রেই কিন্তু ৮৫ পাওয়া যাবে। কিন্তু অনন্যতার ব্যাপারটা থাকছে না, যেটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সংখ্যাতত্ত্বের অতঙ্গলো উপপাদ্য। আসলে ১ যতগুলো থাকুক কিন্তু যাবে-আসবে না। এটাকে আমি চিন্তা করি রসায়নে পানির অণুর ভেতরে থাকা শূন্যস্থানের মতো। হাইড্রোজেন দুইটা আর অক্সিজেন একটা ছাড়াও পানির অণুতে আছে শূন্যস্থান। শূন্যস্থান কয়টা আছে? একটা বললেও যা, দুইটাও তা, দুই শটাও তা। শূন্যের ওপরেই সব অবস্থান করে। শূন্যস্থান যে রকম অণু গঠনের শুরুর অবস্থা, গুণ আকারে লেখার ক্ষেত্রে সংখ্যার শুরুর অবস্থা হলো ১। ১ থেকে সব গুণ শুরু হয়, ১-কে বলে শূন্যতার গুণফল। এ কারণেই কোনো সংখ্যার পাওয়ার শূন্য হলে তার মান ১ হয়। তো, যতগুলোই ১ নাও, সংখ্যার মান অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু ওই যে বললাম, ‘অনন্য উপায়ে বা ঠিক একভাবে প্রকাশ’ করার যে উপপাদ্য ওটা আর তখন ঠিক থাকে না। ১-কে বাদ দিলেই ঝামেলা শেষ! এ কারণেই ১-কে মৌলিক সংখ্যায় রাখা হয় না।

তবে চিনা, তুমি দুঃখ পেয়ো না। ১-এর সম্মানও কম নয়! যেহেতু ১ কোনো মৌলিক সংখ্যা না, ১ কোনো যৌগিক সংখ্যা না, সে নিজেই একটা প্রকার। ১ হলো একক।

তৃতীয় সবার দিকে তাকাল, সংখ্যা নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন?

তৰী অনেকক্ষণ ধরে তার খাতার ভেতর আঁকিবুঁকি করছিল। সে উদাস দৃষ্টিতে জিজেস করল, সেদিন এক জায়গায় পড়লাম ফিবোনাচি ধারা বলে একটা বিষয় আছে, সেটা নাকি দারুণ রহস্যময়! ফিবোনাচি সিরিজের রহস্যটা কী? ফিবোনাচি সাহেবের মাথায় এই ধারাটার ধারণাটা এল কোথা থেকে।

তৃতীয় বলল, ‘দেখো, রহস্য বললে একটা ধোয়া ধোয়া ব্যাপার মনে হয়। এখানে অমন কিছু নাই। এটা গণিত, একেবারে পরিষ্কার! ধারাটার কথা আমি বলব—তার আগে মানুষটা নিয়ে একটু বলি। লিওনার্দো ফিবোনাচি ছিলেন একজন ইতালীয় গণিতবিদ। ‘ফিবোনাচি’ মানে হলো ‘বোনাচির ছেলে’। আরবিতে ‘অমুক বিন তমুক’ বলে না? অনেকটা ‘বোনাচির ছেলে’। তো ফিবোনাচি সাহেব একজন ব্যবসায়ীও ছিলেন। তিনি ওই রকম। তো ফিবোনাচি সাহেব একজন ব্যবসায়ীও ছিলেন। তিনি দিয়ে সবকিছু লিখে ফেলে, এখন যেভাবে আমরা লিখি আর কী। ওটা দেখে তিনি মুক্ষ হলেন। কারণ তখনো ইউরোপের মানুষ রোমান ওটা দেখে তিনি মুক্ষ হলেন। কারণ তখনো ইউরোপের মানুষ রোমান সংখ্যা ব্যবহার করত, যেটা দিয়ে গুণ-ভাগ করা খুবই ঝামেলার। তিনি সংখ্যা ব্যবহার করত, যেটা দিয়ে গুণ-ভাগ করা খুবই ঝামেলার। তারপর সারা তার বই ‘Liber Abaci’-তে লিখলেন ব্যাপারটা নিয়ে। তারপর সারা ইউরোপে এটা ছড়িয়ে পড়ল। এটা একটা বিরাট কাজ ছিল। এত বড় একটা কাজ করলেন তিনি অর্থে মানুষ তাকে মনে রাখে শুধু এক ধারার জন্য!

যাহোক ধারাটা অবশ্য খুবই মজার। ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১... ১ আর ১ থেকে শুরু এরপর আগের দুইটা পদ যোগ করে পাওয়া যায়। ১ আর ২ এ ৩; ২ আর ৩ এ ৫ এভাবে। ফিবোনাচি পরের পদটা। ১ আর ২ এ ৩; ২ আর ৩ এ ৫ এভাবে। ফিবোনাচি আবিষ্কারের আরও আগে থেকেই উপমহাদেশের গণিতবিদেরা এটা নিয়ে জানত। তবে যা হয় কী, একবার একটা নাম ছড়িয়ে গেলে সেটাই বিখ্যাত হয়ে যায়।

তো ফিবোনাচি এটা তৈরি করেছিলেন একটা মজার সমস্যা থেকে। সমস্যাটা ছিল এমন। এক জোড়া বাচ্চা খরগোশ আছে। খরগোশগুলো এমন যে ওরা এক মাসে বয়ঁপ্রাপ্ত হয়। এরপর থেকে প্রতি মাসে জোড়া করে খরগোশ জন্ম দিতে থাকে। যাদের জন্ম দেয় তারা এক জোড়া করে খরগোশ জন্ম দিতে থাকে। তাহলে বছর শেষে কত জোড়া খরগোশ থাকবে?

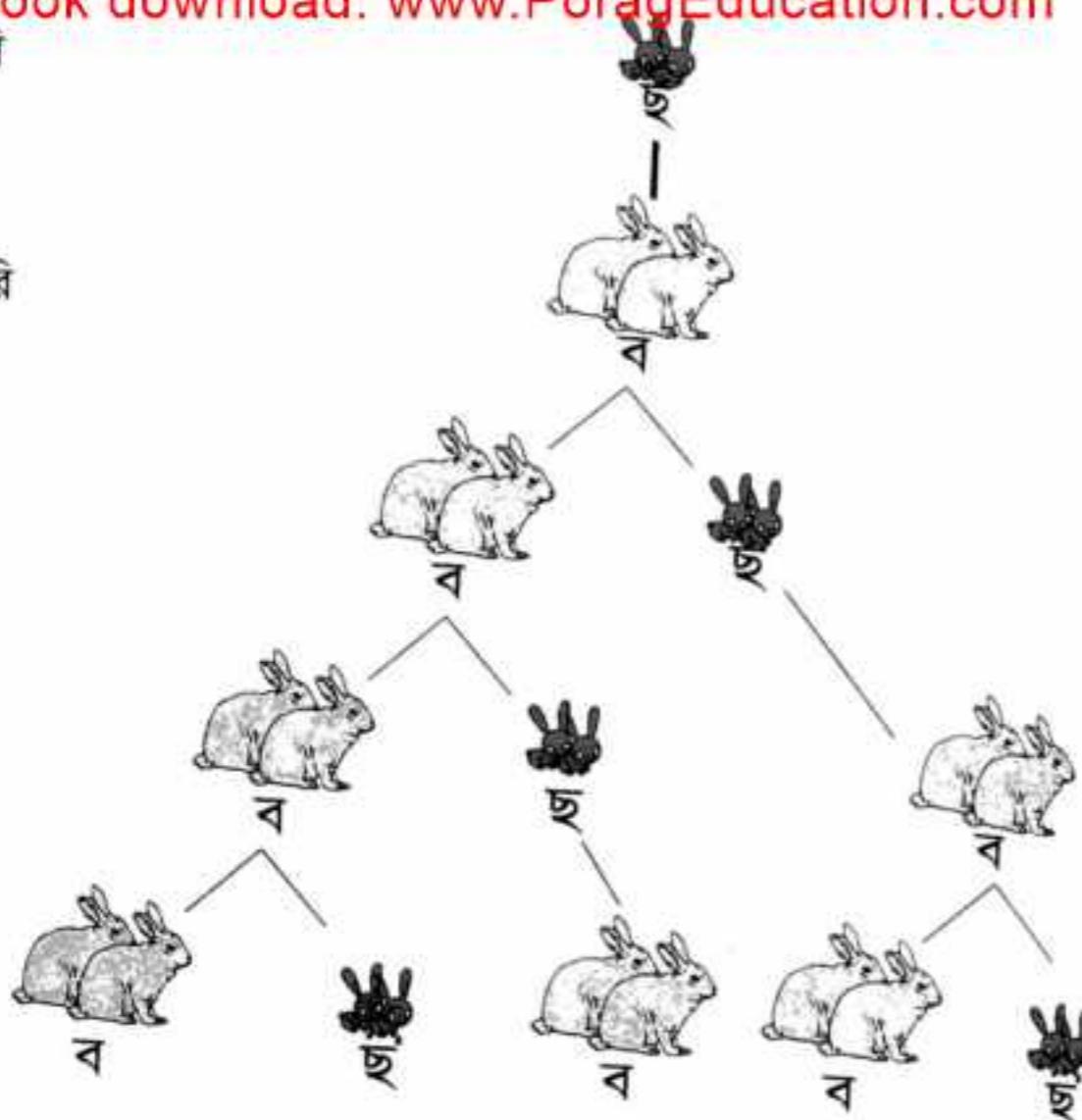
ফিবোনাচি সিরিজ  
কোথেকে এল?

ফেব্রুয়ারি

মার্চ

এপ্রিল

মে



ধরো, ছোট এক জোড়া খরগোশকে আমরা ছ, আর বড় এক জোড়াকে ব দিয়ে লিখলাম। এই ছবিটার দিকে তাকাতে পারো। জানুয়ারিতে ছিল- ছ, এক জোড়া ছোট খরগোশ। ফেব্রুয়ারিতে তারা বড় (ব) হলো।

**মার্চ- ব, ছ (বড় জোড়া তো আছে, সাথে এক জোড়া বাচ্চা )**

**এপ্রিল- ব, ছ, ব (বড় জোড়া আছেই, আরও এক জোড়া বাচ্চা দিয়েছে, আগের ছোট জোড়া বড় হয়ে গেছে)**

**মে- ব, ছ, ব, ব, ছ (প্রথম বড় জোড়া আছেই, আরও এক জোড়া বাচ্চা দিয়েছে, আগের ছোট জোড়া বড় হয়ে গেছে, এপ্রিলের সেই বড় জোড়াও আছে, সেও আরেক জোড়া বাচ্চা দিয়েছে)**

এভাবে যদি জোড়ার সংখ্যা গোনো দেখবে আসবে এমন - ১, ১, ২, ৩, ৫...। দেখো ১ আর ১ যোগ করে হয় ২, এরপর ১ আর ২ যোগ করে ৩। এমন করে আগের দুটো যোগ করে নতুনটা পাওয়া যায়। এটাই ফিরোনাচি সিরিজ। ওপরের ছবিতেও একই জিনিস দেখবে। জানুয়ারির

'ছ' আর ফেব্রুয়ারি 'ব', দুটো মিলে মার্চের 'ব, ছ'। ফেব্রুয়ারির ব, আর মার্চের ব, ছ মিলে এপ্রিলের ব, ছ, ব।

আরও কিছুক্ষণ সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা চলল। যেন উঠতেই মন চায় না। আজ ওঠার সময় টিনা তুর্ঘের মুখে দিকে কোতুহলী দৃষ্টিতে তাকাল, ভাইয়া, আজকে কোনো ধাঁধা দেবেন না?

অবশ্যই! ওই বাক্সটার তলায় দেখো।

সেখানে চারটে কাগজ দেখা গেল আগের মতো। বান্টি তখনই পড়ে ফেলল কী লেখা আছে।

তৃতীয় শতকের বিখ্যাত গ্রিক গণিতবিদ **ডায়োফেন্টাসের কবর** ডায়োফেন্টাস ভালোবাসতেন সমীকরণ নিয়ে ভাবতে। যেসব সমীকরণের সমাধান শুধু পূর্ণসংখ্যায় হতে পারে। তার নাম অনুসারে সেগুলোকে ডায়োফেন্টাইন সমীকরণ বলে। ডায়োফেন্টাসের লেখা বই 'অ্যারিথমেটিকা' প্রাচীন গ্রিসের শ্রেষ্ঠ গণিত রচনাগুলোর একটি। তার মৃত্যুর প্রায় শত বছর পর আরেক গ্রিক গণিতবিদ মেট্রোডোরাস রচনা করেন নিচের কবিতাটি। ডায়োফেন্টাসের সমাধিফিলকে কী লেখা থাকবে সেটা ভেবে। ধাঁধার ছলে ডায়োফেন্টাসের জীবন সম্পর্কে জানা যায় এখান থেকে। নিজের মতো অনুবাদ করে দিলাম কবিতাটি। তোমরা এখান থেকে বের করে ফেলতে পারবে মৃত্যুকালে ডায়োফেন্টাসের বয়স কত ছিল!

এখানে আছেন শুয়ে গুরত ডায়োফেন্টাস— বিশ্বয় জাগে সীমাহীন!

এ পাথর বলে দেবে বীজগণিতের সুরে— আয় তার ছিল কত দিন!

শৈশব ছিল তার ছ' ভাগের এক ভাগ— কেটে গেল দিন কী মজায়!

বারো ভাগের এক ভাগ দুরত্ব কৈশোর- গোফ দাঢ়ি একটু গজায়।

সাত ভাগের এক ভাগ পরে হলো বিয়েশাদি— একাকী জীবনের আসান,

বছর পাঁচেক পরে— এল ঘর আলো করে— ফুটফুটে ছেলেসন্তান।

জনকের অর্ধেক আয় পেল ছেলেটি— নিয়তির নিঠুর বিধান,

পুত্রের শোকে ডায়োফেন্টাস সঁপে দেন— সংখ্যাতত্ত্বে মনপ্রাণ।

বছর চারেক পরে এ ভবের মায়া ছেড়ে তিনিও গেলেন পরপার,

ওহে জ্বানী-গুণীজন, কর দেখি নিরূপণ— ক'বছর আয়ু ছিল তার!

বাসায় ফিরতে ফিরতে বান্টির মনে হলো এটা আসলে খুব সহজ ধাঁধা।  
বয়সটাকে x ধরে নিলেই হয়ে যাবে। হলোও তা-ই। হঠাৎ তার মাথায়  
প্রশ্ন এল, আচ্ছা আমরা x ধরি কেন? অন্য কোনো অক্ষরও তো ধরতে  
পারতাম। কাল ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

অধ্যায় ৪

## বীজগণিতের বিচ্চির চিন্তা

৪.১

তৃর্যের আজকে বাসায় ফিরতে দেরি হলো একটু। ঢাকা থেকে ওর বেশ  
কয়েকজন বন্ধু এসেছে, তাদের সাথে নদীর পাড়ে আড়তা দিতে দিতে  
ওর মনেই ছিল না, সন্ধ্যায় ওর ছাত্রছাত্রীরা আসবে। মনে পড়তেই  
বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিল তড়িঘড়ি করে। স্থানীয় বন্ধুরা টিনা  
আর তবীকে ইঙ্গিত করে কয়েকটা কথাও শুনিয়ে দিল। তৃর্যের অবশ্য  
গায়ে লাগল না। সে জানে ওর প্রতি খুব শ্রদ্ধার জায়গা একটা আছে  
মেয়েগুলোর, অন্যায়ের সীমারেখা সে কখনোই অতিক্রম করবে না।

যত দ্রুত পারে সাইকেল চালিয়ে ঘরে ফিরে এল তৃর্য। কলাপসিবল  
গেটের ভেতরে সাইকেলটা কোনোমতে রেখে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল  
সে। আধা ঘণ্টার ওপরে অপেক্ষা করছিল তৃর্যের ছাত্রছাত্রীরা, বেশ  
অধৈর্য দেখাচ্ছিল সবাইকে। তৃর্য ঢুকেই ক্ষমা চেয়ে নিল দেরির জন্য।  
হাত-মুখ  
বেচারার বেগতিক অবস্থা দেখে আর কিছু বলল না কেউ। হাত-মুখ  
ধূয়ে এসে দেখে তৃর্যের মা সবার জন্য পাকান পিঠা ভেজে এনেছিলেন,  
তৃর্যের জন্য দেড়খানা রেখে বাকিগুলো সবাই সাবাড় করে দিয়েছে।  
অর্ধেকটা দেখিয়ে বান্টি বলল, ভাই, দ্বি বিয়োগ অর্ধ দ্ব্যর্ধ! হেসে সেটা  
মুখে পুরে তৃর্য বলল, আডকেবীডগনিট। সবাই প্রায় একসাথে জিজ্ঞেস  
করল, কী?

এক ঘন্টা অঙ্ক করানোর পর তৃয বলল, ব্যস আর না। এইবার প্রশ্নোত্তরের পালা। বলো বৎসগণ, কী জানিতে চাহো?

বান্তি হাত তুলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তৰী প্রথম প্রশ্ন করল, ভাইয়া, এটাকে বীজগণিত নাম দিল কেন?

### বীজগণিত আৱ পাটিগণিতেৱ নামৱহ্য

তৃয জানাল, ও পুৱোপুৱি নিশ্চিত না। তবে তার ধাৰণা, একটা সমীকৰণেৱ বীজ বলতে বোৰায় ওই সমীকৰণেৱ সমাধান বা মূল (root)। বীজগণিতেৱ একটা বড় অংশ এই সমীকৰণেৱ মূল বেৱ কৱাৱ কাজে ব্যবহৃত হয়। এ জন্যই হয়তো এটাকে বীজগণিত বলে। এ প্ৰসঙ্গে ও বলল, পাটিগণিতেৱ পাটি মানে জানো তো তোমো? পাটি মানে হলো সারি, যেমন এক পাটি দাঁত। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ এগুলো কৱাৱ সময় সারিবদ্ধভাৱে সংখ্যা লিখে হিসাব কৱা হতো। সেখান থেকেই পাটিগণিত।

### a, b, c, d না ধৰে

### অজানা রাশি কেন x ধৰে নিই?

আমো সমাধানে একটা অজানা রাশিকে (unknown quantity) চলক(variable) হিসেবে ধৰে নিতে পাৱি। এই যেমন, x ধৰি, বা 'ক' ধৰি।

বান্তি এটা জিজেস কৱতে চাচ্ছিল গতকাল রাত থেকেই। সুযোগ পেয়েই জিজেস কৱল, আমো a, b, c, d না ধৰে ইংৰেজিৱ x অক্ষৰটাই কেন ধৰে নিই? এটাৰ কী এমন বিশেষত্ব?

তৃযেৰ মনে পড়ল কয়েক দিন আগে ইউটিউবে দেখা একটা ভিডিওৰ কথা। তোমো কি TedEx-এৱ নাম শনেছ? ওৱা কেউ শোনেনি শনে তৃয বলল, ইউটিউবে টেডেক্সেৱ খুব সুন্দৰ কিছু ভিডিও পাওয়া যায়, বিভিন্ন শ্ৰেণিপেশাৱ মানুষ সেখানে তাদেৱ জ্ঞান, ভাবনা অন্য মানুষেৱ সামনে তুলে ধৱেন। কিছু কিছু ভিডিও খুবই অনুপ্ৰেৱণাদায়ক, চাইলে

দেখতে পাৱো! তো সেখানে তৈৱি মুৱ নামে একজন ভদ্ৰলোক বলেছেন কেন আমো এক্ষ ধৰি। এই যে বীজগণিত, এটাৰ ইংৰেজি তো অ্যালজেব্ৰা। সেটা এসেছে মধ্যযুগেৱ বিখ্যাত আৱব গণিতবিদ মুসা আল খোয়ারিজমিৰ বই 'হিসাব আল জাৰি ওয়াল মুকাবিলা' থেকে। আল জাৰি' দিয়ে বোৰায় রাশিগুলো সাজানো, যেটাকে আমো এখন 'পক্ষান্ত্ৰ' কৱা। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীৰ দিকে আৱবদেৱ এই বলি 'পক্ষান্ত্ৰ' পৌছে যায় ইউৱোপে— স্প্যানিশদেৱ কাছে। সেখানে গণিতজ্ঞান পৌছে যায় ইউৱোপীয়দেৱ জন্য উচ্চারণ কৱা খুব কঠিন। আৱবিতে যেগুলো ইউৱোপীয়দেৱ জন্য উচ্চারণ কৱা খুব কঠিন। আৱবিতে শব্দটা একটা অক্ষৰ আছে, যেটা দিয়ে তৈৱি একটা শব্দ হলো 'শালান', যে শব্দেৱ মানে হলো 'কিছু'। এৱ সামনে 'আল' বসিয়ে 'আল-শালান' বা 'কিছু একটা'। এই শব্দটা আৱব গণিতবিদেৱ হয় 'আল-শালান' বা 'কিছু একটা'। এই শব্দটা আৱব গণিতবিদেৱ অজানা রাশি বোৰাতে ব্যবহাৰ কৱতেন। স্প্যানিশ অনুবাদকেৱা এই অজানা রাশি বোৰাতে ব্যবহাৰ কৱতেন। যেহেতু অজানা রাশি বোৰাতে এই শব্দটা নিয়ে পড়লেন বিপাকে। যেহেতু অজানা রাশি বোৰাতে এই শব্দটা খুবই প্ৰচলিত— তাৱা অজানা বোৰাতে এই শব্দটাই ব্যবহাৰ কৱতে চাইলেন, কিন্তু তাদেৱ ভাষায় 'শশশ' উচ্চারণটাই নাই! তাৱা কৱতে চাইলেন, কিন্তু তাদেৱ ভাষায় 'ক' আৱ 'খ' এৱ মাঝামাঝি— ঠিক কৱলেন তাৱা উচ্চারণ কৱবেন 'ক' আৱ 'খ' এৱ মাঝামাঝি— ঠিক কৱলেন তাৱা লিখতেন গ্ৰিক অক্ষৰ 'কাই' দিয়ে যা দেখতে ইংৰেজি 'x' যেটাকে তাৱা লিখতেন গ্ৰিক অক্ষৰ 'কাই' দিয়ে যা দেখতে ইংৰেজি 'x' অক্ষৱেৱ মতো। লাতিনৰা যখন স্প্যানিশ ভাষা থেকে অনুবাদ কৱলেন, তাৱা কাই বাদ দিয়ে তাদেৱ নিজেৱ প্ৰতীক 'x' ব্যবহাৰ কৱলেন। তাৱা কাই বাদ দিয়ে তাদেৱ নিজেৱ প্ৰতীক 'x' ব্যবহাৰ কৱলেন।

ওখন থেকেই গেল ইংৰেজিতে আৱ তাৱপৱে সব ভাষায়!

বান্তি ফোড়ন কাটল, তাৱ মানে স্প্যানিশ ব্যাটাৱা শ বলতে পাৱত না

বলে আমাদেৱ এক্ষ বলতে হয়! মাৰাত্মক ব্যাপার-স্যাপার!

হুম, তবে তাৱ মতো বিৱোধিতাও আছে। অনেকে বলেছেন, এখন স্প্যানিশে 'শ' না থাকলেও প্ৰাচীন স্প্যানিশ ভাষায় 'শ' ছিল এবং সেটা 'X'-এৱ মতো দেখতে একটা প্ৰতীক দিয়েই লেখা হতো।

দিলেন তো মজাটা নষ্ট কৱে। সবাই হেসে উঠল। পৃথী বলল, আমাদেৱ

স্যার বলেছিলেন a, b, c, d এগুলো দিয়ে বোবায় জানা রাশি আর x, y, z এগুলো দিয়ে অজানা। সেটা কি তাহলে ভুল?

না, না, উনি ঠিকই বলেছেন। a, b, c, d জানা রাশি আর x, y, z অজানা এভাবে লিখতে প্রথম শুরু করেন বিখ্যাত গণিতবিদ রেনে দেকার্টে, যিনি স্থানাঙ্ক জ্যামিতির উন্নাবক। তবে আমি যে গল্পটা বললাম সেটা আরও চার শব্দ বছর আগের কথা, তত দিনে x-কে চলক হিসাবে লেখাটা রেওয়াজ হয়ে গেছে।

### অত বীজগণিত শিখে লাভ কী?

এবার টিনা প্রশ্ন করল, আচ্ছা ভাইয়া, বীজগণিতে আমরা তো অনেক কিছু শিখি—  
এগুলোর কি আদৌ কোনো দরকার আছে?

সমীকরণ সমাধানের ব্যাপারটা আধটু-একটু বুবি যে কাজে লাগে; কিন্তু এই যে মনে করেন, ‘উৎপাদকে বিশ্লেষণ’— এই সব জিনিস দিয়ে কী লাভ হয়? জীবনটা এমনিই কঠিন, আরও কঠিন বানায়ে কী লাভটা হলো গণিতবিদদের?

তৃর্য মুখ হাসি করে বাকিদের দিকে তাকাল, বাকিদেরও চোখেও একই জিজ্ঞাসা! তৃর্য বলল, শেখার সময় কিছু ক্ষেত্রে তোমাকে শেষটা না দেখেই শুরু করতে হবে, কিছুটা ভরসা তোমার বই আর শিক্ষকের ওপর রাখতেই হবে। এই যে উৎপাদকে বিশ্লেষণ—এটা বীজগণিতিক রাশিগুলোকে সাজানোর খুব প্রাথমিক একটা ভিত্তি। মনে করো, একটা সমীকরণ আছে যেখানে x-এর সর্বোচ্চ সূচক চার। চারঘাতের রাশির সমাধান হয় চার রকমের। তুমি যদি সব পদ বামপাশে নিয়ে ডান দিকে শূন্য বানাও, এরপর বড় রাশিটাকে চারটে ছোট রাশির গুণ আকারে দেখাতে পারো, তাহলেই কিন্তু চারটে মান পেয়ে যাবে। এগুলো ছোট ছোট কৌশল।

একটা কথা বলি, যে মানুষটাকে দেখলে তোমার মনে হয়, সে অনেক বড় বড় জিনিসপত্র পারে, ভালো করে দেখলে দেখবে, সে আসলে খুব ছোট ছোট কিছু কৌশল জানে, অনেকগুলো ছোট ছোট কাজ সুন্দর করে করতে পারে!

তৃর্যের হঠাৎ যেন কিছু একটা মনে পড়ল, ও  
বলল, কৌশলের কথা যখন বললাম, চলো গণিতের একটি জাদু  
তোমাদের অঙ্কের একটা জাদু শেখাই। পৃথী,  
মনে মনে একটা সংখ্যা ধরো। কাউকে বলবে  
না কিন্তু। পৃথী ধরল ৭।

এবার সংখ্যাটাকে দ্বিগুণ করো। পৃথী মনে মনে ভাবল, ‘১৪’।  
এবারে টিনা, তুমি ওকে একটা সংখ্যা বলো, আমাদের সবার সামনেই  
বলো, অসুবিধা নাই। আর পৃথী তুমি টিনার সংখ্যাটাকে তোমার  
যোগফলের সাথে মনে মনে যোগ দাও। টিনা বলল, ‘১০’। পৃথী যোগ  
করে পেল ‘২৪’।

গুড়। এবার পৃথী, তোমার যোগফলটাকে অর্ধেক করো। সেখান থেকে  
মূল যে সংখ্যাটা ধরেছিলে সেটা বাদ দাও। পৃথী অর্ধেক করে পেল ১২.  
সেখান থেকে মূল সংখ্যা মানে ৭ বাদ দিয়ে পেল ৫।

একটু আগে টিনা যখন সংখ্যাটা বলছিল তখনই তৃর্য বান্টির খাতা নিয়ে  
শেষ পৃষ্ঠায় একটা সংখ্যা লিখে খাতাটা উল্টে রেখেছিল। তৃর্য রহস্য  
করে বলল, আমি কিন্তু তোমার মন পড়ে ফেলতে পারি! বিশ্বাস না হলে  
বান্টির খাতার তলায় দেখো।

পৃথী উল্টে দেখল ওখানে বড়ো করে লেখা ৫। ওর মুখ আবার হা হয়ে  
গেল। বিশ্বাস নিয়ে তৃর্যের দিকে তাকাল ও।

তবী বিশেষ খুশি হলো না, ভাইয়া এটা আমি পারি। আপনি শুধু টিনার  
দেওয়া ১০-কে অর্ধেক করেছেন, তাই না?

তৃর্য বলল, ঠিক তাই। এটা গণিতের খুব প্রচলিত একটা খেলা, আমি  
জানি তোমাদের অনেকেই খেলাটা জানো। কিন্তু তুমি কী জানো কেন  
অর্ধেক করলেই হয়ে যায়? এবার তবী নীরব। তৃর্য বান্টির খাতাটা টেনে  
নিল। মনে করো, পৃথী ধরেছে a আর টিনার দেওয়া সংখ্যা b।

এটাকে a দ্বিগুণ করলে  $2a$ , তার সাথে b যোগ দিলে  $(2a+b)$ । অর্ধেক  
করলে  $\frac{2a+b}{2}$ । এখান থেকে a বাদ দিলে পাবে  $\frac{2a+b}{2} - a$

গণিতের একটি জাদু  
ও তার ব্যাখ্যা

$$\text{वा, } \frac{2a+b}{2} - a = \frac{2a+b-2a}{2} = \frac{b}{2}$$

দেখেছ, পেয়ে গেলাম  $\frac{b}{2}$ , মানে তিনা যা ধরেছিল তার অর্ধেক।

এমন যত খেলা আছে সবগুলোই বীজগণিত দিয়ে বুঝে ফেলা যায়।

**গণিতের আরেক জাদু  
এবং তার ব্যাখ্যা**

ভাইয়া, একবার শুনেছিলাম ৬ বা ৭ অঙ্কবিশিষ্ট  
সংখ্যাকে তিনটা সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে  
ভাগশেষ শূন্য হয়? ওই সংখ্যাগুলো কী কী  
একটু বলবেন?

এটাও একটা মজার খেলা। তিন অঙ্কের যেকোনো সংখ্যা নাও! সংখ্যাটাকে আবার লিখে পাশাপাশি বসাও! ছয় অঙ্কের একটা সংখ্যা পাবে! এই ছয় অঙ্কের সংখ্যাটা অবশ্যই ৭, ১১ আর ১৩ দিয়ে বিভাজ্য হবে! আমার ধারণা তোমরা এটার কথাই বলছ!

এটা আসলে সহজ একটা ফাঁকি! তিন অঙ্কের কোনো সংখ্যাকে আবার পাশাপাশি বসানোর মানে হলো তাকে ১০০১ দিয়ে গুণ করা! যেমন  
 $143 \times 1001 = 143143$

কারণ ১০০০ দিয়ে গুণ দিলে শেষে তিনটি শূন্য থাকবে! আর ১ দিয়ে গুণ দেওয়া মানে আগের সংখ্যাটাই ওই শূন্যগুলোর সাথে যোগ করে দেওয়া!

तार माने १४३१४३-ेर मध्ये आছे १४३ आर १००१; किन्तु १००१-ेर मध्ये की आছे?  $1001 = 7 \times 11 \times 13$

ଅର୍ଥାତ୍  $143 \times 143 = 143 \times 7 \times 21 \times 23$

তাই সংখ্যাটা ৭, ১৩ আর ১১ দিয়ে বিভাজ্য! এখানে ১৪৩ না হয়ে তিনি  
অঙ্কের যেকোনো সংখ্যা হলেও এটা কাজ করবে!

কথায় কথায় তৃ্য জানাল, বীজগণিতের আরেকটা সূত্র আমার খুবই  
প্রিয়।

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

বান্ডি তাচ্ছিলের সুরে বলল, ভাইয়া, এইটা কী বললেন? এই সূত্র

আবার প্রিয় হয় নাকি কারও

তৃষ্ণ চোখ বাঁকিয়ে বান্টিকে বলল, মুখে মুখে বলো তো ১১৩-এর বর্গ কত?

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে দেখে তৃষ্ণ বলল, তোমাদের অধিকাংশই  
মুখে মুখে বলতে পারবে না, আমি জানি। কিন্তু একটু পরেই তোমরা  
পারবে, ভরসা রাখো আমার ওপরে।

সংখ্যা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ব্যাপারগুলোর একটা।  
আমার ক্লাস নাইন-টেনের একটা বড় সময় চলে গেছে সংখ্যা নিয়ে  
ভাবতে ভাবতে। আর সেই সময়টা যে কী অস্তিত্ব সুন্দর কেটেছে  
সেটা ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারব না।

তোমাদের বয়সে আমার খুব প্রিয় একটি  
কাজ ছিল মনে মনে সংখ্যার বর্গ করা  
খুব দ্রুত পারতাম না আমি সাধারণ  
মানুষ, কোনো প্রডিজি না, তবে দুই ঘ  
হলে পারতাম।

এখন তোমাদের চলো শিখিয়ে দিই, মনে মনে কীভাবে বর্গ করতে হয়।  
 সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে টেবিলে ভাইয়ার খাতার দিকে তাকাল। সেখানে  
 কতগুলো সংখ্যা লিখল সে। তারপর দার্শনিকের মতো বলল, গণিত  
 শিখতে হলে আগে দেখতে শিখতে হবে, গভীরভাবে দেখতে হবে।  
 হৃদয়ের সবগুলো জানালা খুলে দাও, আলো আসুক, বাতাস আসুক—  
 যদি কোনো দুঃসংবাদ আসতে চায়, তাকেও আসতে দাও... সবকিছু  
 আসুক... ভুলটাকে পরে ফেলে দেওয়া যাবে। এসো, এই প্যাটার্নগুলো  
 ভালো করে দেখো...।

১১-এর বর্গ = ১২

১০১-এর বর্গ = ১০২০১

১০০১-এর বর্গ = ১০০২০০

১০০১-এর বর্গ = ১০০০২০০০

সবাই দেখতে দেখতে বুঝল, ব্যাপারটা মজার।

এখন আমি যদি জিজ্ঞেস করি, বলো তো, ১ (এরপর ১ কোটিটা শূন্য) ১-এর বর্গ কত? বলতে পারবে?

সবাই প্রায় একসাথে বলল,

১ (এরপর ১ কোটিটা শূন্য) ২ (এরপর ১ কোটিটা শূন্য) ১

বাহ! আবার লক্ষ করো,

১০১-এর বর্গ = ১ ০২ ০১

১০২-এর বর্গ = ১ ০৪ ০৪

১০৩-এর বর্গ = ১ ০৬ ০৯

১০৪-এর বর্গ = ১ ০৮ ১৬

এইটুকু দেখা হলে একটু থামো। ভালো করে আবার দেখো।

মূল সংখ্যাটার দিকে একবার তাকাও, আর এর বর্গের দিকে একবার তাকাও, দেখো তো কোনো মিল খুঁজে পাও কি না।

একটু তাকালেই দেখবে আমার মূল সংখ্যাগুলো সব শুরু হয়েছে ১ দিয়ে আর তারপর দুইটা ঘর আছে।

বর্গটাতে শুরুতেই আছে ১। এরপর দুইটা দুইটা করে ঘর রেখেছি। তাকিয়ে দেখো প্রথম দুই ঘরে আছে দ্বিগুণ আর শেষ দুই ঘরে আছে বর্গ।

যেমন ১০৪-এর ক্ষেত্রে প্রথমে ১-এর পর দুইটা দুইটা করে ঘর রেখেছি

১ -- --

এরপর প্রথম দুই ঘরে বসিয়েছি ০৪-এর দ্বিগুণ ০৮

১ ০৮ --

আর শেষ দুই ঘরে বসিয়েছি ০৪-এর বর্গ ১৬

১ ০৮ ১৬

তাহলে এবার তোমরা বলো তো, ১০৫-এর বর্গ কত? সবাই পেরে গেল!

১০৫-এর বর্গ = ১ ১০ ২৫

ঠিক একইভাবে ১০৬-এর বর্গ = ১ ১২ ৩৬

এখন যদি প্রশ্ন করি, আচ্ছা বলো তো,

১১২-এর বর্গ কত?

তাহলে সামান্য ঝামেলায় পড়তে পারো...

প্রথমে তো ১ লিখে জায়গা রাখলে দুটো দুটো করে

১ -- --

প্রথম দুই ঘরে বসল ১২ দুগুণে ২৪

১ ২৪ --

এরপরেই ঝামেলা— ১২-এর বর্গ হলো ১৪৪ সেটাতে আছে ৩ ঘর।  
কিন্তু আমাদের বর্গের শেষে তো মাত্র দুটি ঘর ফাঁকা আছে, তাহলে?

চিন্তা কী? শেষ দুই ঘরে ১৪৪-এর ৪৪ বসবে, হাতে থাকবে ১। সেটা  
গিয়ে যোগ হবে ২৪-এর সাথে, হবে ২৫।

তাহলে সংখ্যাটা হবে- ১ ২৫ ৪৪

ব্যস! ওটাই হবে ১১২-এর বর্গ।

তাহলে বান্টি, এবার কী পারবে, ১১৩-এর বর্গ কত হবে বলতে?

বান্টি বলল, ১ তারপর হবে ২৬, তারপর ১৩-এর বর্গ ১৬৯। ১ হাতে  
থাকবে।

সুতরাং ১১৩-এর বর্গ হবে ১ ২৭ ৬৯। ঠিক আছে ভাইয়া?

অবশ্যই!

বান্টি মনে হলো বিরাট একটা কাজ করে ফেলেছে। সে মনে মনে তিনি

ঘরের একটা সংখ্যার বগ করে ফেলেছে—এট ভেবেই আনন্দে অস্তির হয়ে গেল। এটা যেন গণিত নিয়ে তার ১৫ বছরের জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন!

তৃতীয় থামল না। ও বলল, যদি এতক্ষণ যা বললাম সেটা দেখে থাকো, তাহলে কি বলতে পারবে ১০১২-এর বর্গ কত?

তুম্বী বলল, এবারে কি আমাদের তিনটা তিনটা করে ঘর নিতে হবে?

তৃতীয় বলল, হ্যাঁ, মূল সংখ্যায় ১-এর পর তিনটা ঘর আছে, তাই বর্গ করার সময় ১-এর পর তিনটা তিনটা করে ঘর রাখো এভাবে

১ --- ---

আগের মতো প্রথম তিন ঘরে বসবে ০১২-এর দ্বিগুণ, আর শেষের তিন ঘরে বর্গ; সংখ্যাটা দাঁড়াবে ১০২৪ ১৪৪

উত্তর ঠিক আছে, কিন্তু একটা ব্যাপার আছে। আমি এতক্ষণ যা করলাম সেটা অনেকটা প্রাইমারি স্কুলের স্যারদের মতো-- ‘তোরা দ্যাখ, এমনে এমনে অঙ্ক করতে হয়।’ কেন এটা হলো সেটা বলিনি। কিন্তু গণিতের আনন্দের একটা বড় অংশ এই ‘কেন’ প্রশ্নটা জুড়ে। তাই তোমাদের বলে রাখি, শিক্ষক যত ভালোই হোন না কেন, তাকে সরাসরি বিশ্বাস করে নেবে না। একবার নিজে ভাববে, তিনি এমন কেন বললেন, এটা কেন হলো, এটা কি আসলেই ঠিক?

এবারে বলি আমার এই নিয়মটা কেন কাজ করে। আসলে এর পেছনে আছে একটা খুবই ক---ঠি---ন সূত্র:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

কী বিশ্বাস হচ্ছে না?

চলো বোঝাই ১০৮-এর বর্গটা দিয়ে।  $108 = (100 + 8)$

$$\text{এখন } (100+8)^2 = 100^2 + 2 \times 100 \times 8 + 8^2$$

১০০ <sup>২</sup>	১০০ ০০	এ জন্যই বলেছিলাম ১-এর পর দুটো দুটো করে ঘর রাখো
+ ২×১০০×৮	৮ ০০	মাঝের প্রথম দুই ঘরে ০৪-এর দ্বিগুণ
+ ৮ <sup>২</sup>	১৬	শেষের দুই ঘরে ০৪-এর বর্গ
মোট	১০৮ ১৬	

টিনা উসখুস করছিল, ভাইয়া, যদি সামনে ১ না থাকে? তখন কী হবে? খুবই ভালো প্রশ্ন। আমি আমার মূল সংখ্যাটাতে সব সময় সামনে ১ রেখেছি। বোকানো শুরু করার জন্য এটা অনেক ভালো। কিন্তু দুনিয়ার সব সংখ্যা তো আর ১ দিয়ে শুরু হয় না, তাই না? তাহলে ৫ ০১৩-এর বর্গ কীভাবে করা যাবে? চিন্তা কী? আমরা তো এখন মূল সূত্রটা জানিই। আগেরবার বর্গের প্রথমে ১ রেখেছিলাম কারণ ১-এর বর্গ ১। এখন মূল সংখ্যায় যদি ৫ থাকে, বর্গে থাকবে ২৫ - এ আর এমন কী? এরপর তিনটা তিনটা করে ঘর রাখি—

২৫ --- ---

লক্ষ করো, আগের বার প্রথম তিনটা ঘরে বসিয়েছিলাম শুধু ০১৩-এর দ্বিগুণ। এবারে কিন্তু তা বসালে চলবে না। কারণ মূল সূত্রে আছে  $2ab$ । তাই বসাতে হবে  $2 \times 5 \times 013 = 130$ । শেষের তিন ঘরে আগেকার মতোই ০১৩-এর বর্গ। সংখ্যাটা দাঁড়াবে— ২৫ ১৩০ ১৬৯

ভেঙে বললে,  $৫০১৩ = (৫০০০ + ১৩)$ । এখন  $(৫০০০ + ১৩)^2 =$

৫০০০ <sup>২</sup>	২৫ ০০০ ০০০	এ জন্যই বলেছিলাম ২৫-এর পর তিনটা তিনটা করে ঘর রাখো
+ ২×৫০০০×১৩	১৩০ ০০০	মাঝের ঘরে $2ab$
+ ১৩ <sup>২</sup>	১৬৯	শেষের দুই ঘরে ১৩-এর বর্গ
মোট	২৫ ১৩০ ১৬৯	

এই কাজগুলো মনে মনে করাটা কি খুব কঠিন? মনে হয় না।

এবং তুমি কি বুঝতে পারছ, তুমি কত শক্তিশালী হয়ে উঠেছ?

তুমি যদি তোমার কোনো বন্ধুকে গিয়ে বলো যে ৫০১৩-এর বর্গ— এ আর এমন কী— এটা হলো ২৫ ১৩০ ১৬৯ বা দুই কোটি একান্ন লক্ষ লক্ষ তিরিশ হাজার এক শ উনসত্ত্ব।

তোমার কি মনে হয়, সে অবাক হবে না? অথচ দেখ সূত্রটা কত চেনা; সেই ছেলেবেলার ‘এ প্লাস বি হোল-স্কয়ার’-এর সূত্র।

বর্গ এ পর্যন্তই। ও আচ্ছা, তোমরা তো ‘এ প্লাস বি হোল-কিউব’-এর সূত্রও জানো। তাহলে ১০২০-এর মান যে ১ ০৬ ১২ ০৮ হয়, এটা বোঝো নাকি, চেষ্টা করে দেখো তো।

সবাই ধারণা করতে পারল মূল ব্যাপারটা কেমন হবে। এবার পৃথী বলল, আচ্ছা ভাইয়া, এর উল্টোটা কীভাবে করে?

মানে?

পৃথী বলল, মানে ভাইয়া, আমরা তো এখানে কিউব করলাম, কিন্তু কিউব যদি দেওয়া থাকে মূল সংখ্যাটা কীভাবে বের করা যাবে?

**বর্গমূল, ঘনমূল এবং যেকোনোতম  
মূল বের করার উপায়**

তৰী বলল, আমরা ক্লাস সেভেনে হাতে-কলমে বর্গমূল করা শিখেছিলাম, কিন্তু ঘনমূল পারি না। এটা কি করা যায়?

তৰ্য বলল, অবশ্যই যায়। সেখানেও লাগে এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্র [এ বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট ১-এ নিয়মটি দেওয়া আছে, আগ্রহীরা অবশ্যই দেখে নিয়ো, অনেক কিছু শিখতে পারবে]। তা ছাড়া দ্বিপদী উপপাদ্য বলে একটা উপপাদ্য আছে, যেটা নিউটন দিয়েছিলেন। তোমরা এটা যদিও ইটারমিডিয়েটে গিয়ে শিখবে, তবু হালকা ধারণা দিতে পারি। এটার সাহায্যে অসীম ধারা ব্যবহার করে যেকোনো মূল বের করা যায়।

এর জন্য সংখ্যাটাকে  $(1+x)^n$  আকারে নিতে হবে, যেখানে  $x$ -এর মান -1 থেকে +1-এর ভেতরে। এরপর দ্বিপদী উপপাদ্যের সাহায্যে বের

করা যাবে। সূত্রটা হলো—

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots + \infty$$

এই সূত্র ব্যবহার করার সময় একটু সাজিয়ে নিতে হয়, যেন  $x$  টা -1 থেকে 1-এর ভেতরে হয়।

মনে করো, এটা দিয়ে তুমি বের করতে চাও ৫-এর ঘনমূল বা  $\sqrt[3]{5} = 5^{\frac{1}{3}}$  এটাকে সাজানো যায় এমন করে  $5^{\frac{1}{3}} = (\frac{1}{5})^{\frac{1}{3}} = (1 - \frac{4}{5})^{\frac{1}{3}}$ ।

এখন আমরা সূত্রে ফেলতে পারব। কারণ  $x$  এখন  $-\frac{4}{5}$ ।

$(1 - \frac{4}{5})^{\frac{1}{3}} = 1 + (-\frac{1}{3})(-\frac{4}{5}) + \frac{(-\frac{1}{3})(-\frac{1}{3}-1)}{2!}(-\frac{4}{5})^2 + \dots + \infty$  এমন করে আরও কয়েকটা পদ নিয়ে মান বের করে যোগ করলে ঘনমূলের একটা অনুমান পাবে। এই ধারার সুবিধা হলো যেকোনো মূল পাওয়া যায়।

বান্টি বলল, ইয়ে মানে এই ধারাটা কীভাবে এল, এইটা কি বলবেন?

তৰ্য হেসে বলল, খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন। কিন্তু এটা এখনই তোমাদের বোঝাতে পারব না, কিছু উচ্চতর ধারণা ব্যবহার না করে এটা প্রমাণ দেওয়া সম্ভব না।। তবে আগে যা বলেছি, আমি বোঝাতে না পারলেও প্রশ্নকে মেরে ফেলবে না। এটা মাথায় রাখো, মাথায় না থাকলে খাতায় লিখে রাখো। চেষ্টা করো নিজে খুঁজে বের করার। নাহলে যখন এইচএসসি বইয়ে পড়বে, তখন মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে। তবু না পারলে আমি তো আছিই!

পৃথী একটু কাঁচুমাচু করে বলল, ভাইয়া, **লগ জিনিসটা আসলে কী?** আমার একটা প্রশ্ন আছে। পাওয়ার আর মূল দেখে মনে হলো এখনই জিজেস করে ফেলি। ভাইয়া, লগ জিনিসটা কী? লগ দিয়ে অঙ্ক করতে পারি কিন্তু জিনিসটা আসলে কী সেটাই বুঝি না।

তৰ্য বলল, কোনো কিছু না জানা অন্যায় কিছু না। জানার আগ্রহ নষ্ট করে ফেলাটা অন্যায়। এই যে তুমি জানতে চেয়েছ আমার কাছে, এতেই অনেকখানি এগিয়ে গেলে তুমি!

বীজগণিতের সাতটা অপারেশন  
কী কী?

লগ আম বোবাব, তার আগে  
তোমরা বলো, বীজগণিতের সাতটা  
অপারেশন কি তোমরা জানো?  
চিনা বলল, বীজগণিতেও অপারেশন আছে? ওরে বাবা, আমার মনে  
হয় ব্রেন অপারেশন করতে হবে!

তৃষ্ণ বলল, না না, অপারেশন শব্দ দেখে ভয় পেয়ো না! যোগ, বিয়োগ,  
গুণ, ভাগ—এগুলোই হলো একেক রকম অপারেশন। এই চারটে  
ছাড়াও আছে তিনটা সূচকের অপারেশন।

তৰী বলল, সূচক বা পাওয়ার তো চিনি। কিন্তু এর আবার তিনটা  
অপারেশন কী রকম?

তৃষ্ণ খাতায় লিখল,  $2^0=1$

দেখো, এই লাইনটায় তিনটে সংখ্যা আছে। তাদের বের করার জন্য  
তিনি রকম প্রশ্ন করা যায়,

- (i) দুই-এর ওপর সূচক তিন হলে তার মান কত হয়?  $2^3=8$
- (ii) কার মাথার ওপর সূচক তিন হলে তার মান আট হয়?  $2^3=8$
- (iii) দুই-এর ওপর সূচক কত হলে তার মান আট হয়?  $2^3=8$

এই তিনি প্রশ্ন থেকে তিনি অপারেশন। প্রথমটাকে বলে সূচক। এটা  
তোমরা জানো, এর মানে দুইকে তিনবার গুণ করতে হবে। এরপর  
দ্বিতীয়টার দিকে তাকাও— এটা আসলে মূল বের করা। ‘কার ওপর  
সূচক তিন হলে তার মান আট হয়’—এই বাক্যটার আরেকটা মানে  
হলো ‘আট-এর ঘনমূল কত’?

তৃতীয়টার দিকে তাকাও এবার— দুই-এর ওপর সূচক কত হলে তার  
মান আট হয়? আমরা এখানে পাওয়ারটা কত সেটা খুঁজে বের করছি।  
এখানেই আছে  $\log$ । এটাকেই আমরা লিখি  $\log_2 8$ (দুই ভিত্তিক লগ  
আট)। এটার মানেই হলো দুইয়ের পাওয়ার কত হলে আট হবে?

তাহলে পৃথী বলো তো,  $\log_3 9$ — সোজা বাংলায় এটার মানে কী?

পৃথী বলল,  $\log_3 9$ -এর মানে হলো 3-এর পাওয়ার কত হলে তার মান  
9 হয়।

এই তো বুঝে গেছ। তাহলে বলো সেই পাওয়ারটা কত?

পৃথী বলল, 9 হতে গেলে 3-এর পাওয়ার হতে হবে 2।

বেশ! তার মানে,  $\log_3 9 = 2$ ।

তৰী বলল, ও, তাহলে লগ দিয়ে আসলে পাওয়ারটা খুঁজে বের করে।  
লগ এর উভরঙ্গলো আসলে একেকটা পাওয়ার।

হ্ম, ঠিক ধরেছ!

তৰীর চোখজোড়া জুলজুল করে উঠল, এবার বুকাতে পারছি, ভাইয়া  
কেন  $\log$ -এর ভিত্তি আর সংখ্যাটা মিলে গেলে তার মান 1 হয়।

চিনা অবাক হয়ে তৰীর দিকে তাকাল, তৰীই বুবিয়ে দিল। দেখো,  
আমরা জানি,  $\log_a a = 1$ ।

হু?

এখন  $\log_a a$ -এর মানে কী?  $a^x$ -এর পাওয়ার কত হলে তার মান  $a$  হবে।  
নিশ্চয়ই 1 হলে। কোনো সংখ্যার পাওয়ার 1 হলেই তো সংখ্যাটা ওই  
সংখ্যা নিজেই থাকে!

ও বুঝেছি এইবার!

ঠিক ধরেছ, তৃষ্ণ বান্টির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি চিন্তা করে বলো তো,  
লগ-এর ভিত্তি কি 1 হতে পারে?

বান্টি ভুঁ কুঁচকে বলল, প্রশ্নটা বুবিয়ে বলবেন?

তৃষ্ণ বলল, আছ্ছা তুমি বলো  $\log_1 100$ -এর মান কত হবে?

বান্টি বলল, আপনি যেভাবে বললেন, সেটা অনুসারে  $\log_{10} 100$  মানে  
হলো, 1-এর পাওয়ার কত হলে তার মান 100 হবে। ও, এবার বুঝেছি,  
এটা আসলে সম্ভব না! 1 ওপর যতই পাওয়ার তুলি না কেন, তার মান  
সারা জীবন 1-ই থাকবে। 100 আর কখনো পাওয়া যাবে না।

তৃষ্ণ বলল, ঠিক তা-ই। ১০০ কেন, ১ ওপর পাওয়ার তুললে ১ ছাড়া আর কোনো সংখ্যাই পাওয়া যাবে না! তাই ১ কখনো লগ-এর ভিত্তি হয় না।

### লগের ভেতর গুণ থাকলে বাইরে আলাদা করে যোগ হয় কেন?

তৃষ্ণ মজা করে কুর্নিশ করার মতো করে বলল, জি জনাবা, আপনি সম্পূর্ণ সঠিক! লগের ভিত্তি শূন্যও হয় না কখনো!

এবার তোমাদের বলি, log-এর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যেটা অনেক কাজে লাগে।  $\log(ab) = \log a + \log b$ ; log-এর ভেতরে যদি দুটো সংখ্যা গুণ আকারে থাকে তাহলে তাদের আলাদা করে নিয়ে যোগ আকারে দেখানো যায়। কিন্তু এটার আসলে মানেটা কী, সেটা কি তোমরা জানো? সবাই না সূচক মাথা ঝাঁকাল।

তৃষ্ণ বলল, এই যে ভেতরে গুণ ছিল, বাইরে যোগ হয়ে গেল, এটা গাণিতিকভাবে প্রমাণ করা যায় কিন্তু আমি প্রমাণ করতে চাই না। আমি জিনিসটা মন থেকে বুঝতে চাই। এটাও খুব মজার।

এটা জানতে গেলে আগে সূচকের একটা বৈশিষ্ট্য থেকে ঘুরে আসতে হবে। লক্ষ করো এই দুটো গুণ করলে কী হয়—  $2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$ । আমরা জানি যে এ রকম গুণ করলে পাওয়ার যোগ হয়ে যায়। কেন এ রকম যোগ হলো সেটা কি বোঝো?

$2^3$  মানে হচ্ছে এখানে ২ সংখ্যাটি ৩ বার গুণ আকারে আছে অর্থাৎ  $2^3 = 2 \times 2 \times 2$  এবং  $2^4$  মানে হচ্ছে এখানে ২ সংখ্যাটি ৪ বার গুণ আকারে আছে অর্থাৎ  $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$ । তাহলে দুটোর গুণফলে মোট কতগুলো ২ গুণ আকারে আছে?

$2^3 \times 2^4 = (2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2 \times 2)$ ; দেখো এখানে মোট ৭টি দুই গুণ আকারে আছে। মোট কতগুলো ২ গুণ আকারে রয়েছে সেটা বের করতে ৩ আর ৪ যোগ করছি আমরা। এভাবেই সূচকগুলো যোগ হয়ে যায়।

চিনা বলল, তাহলে তো শূন্যও কখনো লগের ভিত্তি হবে না। ০ এর মাথার ওপরে যাই ০-ই তো পাব!

তাহলে তোমরা এখন জানো যে গুণফলের যে পাওয়ার, সেটা হচ্ছে আলাদা করে প্রতিটা পাওয়ারের যোগফল। জানো, আমরা যখন লিখি  $\log ab = \log a + \log b$ , এখানে ঠিক সে কথাটিই বলা হয়েছে। মোটাদাগে,  $\log ab$  মানে  $ab$ -এর পাওয়ার,  $\log a$  মানে  $a$ -এর পাওয়ার আর  $\log b$  মানে  $b$ -এর পাওয়ার।

যাদের ব্যাপারটি এখনো পরিষ্কার হচ্ছে না তাদের পরিষ্কার করানো যাক। চলো, ওপরে যেটা লিখলাম সেটাকে ২ ভিত্তি নিয়ে ভাবি।

$$\log_2(ab) = \log_2 a + \log_2 b$$

এখানে ধরি,  $a=2^3$ ,  $b=2^4$ । ফলে  $ab=2^7$

তাহলে এখন দেখো  $\log_2 ab = \log_2 2^7$ । দেখো, এটার মানেটা মজার। আগের মতো করে ভাবো,  $\log_2 2^7$  মানে হলো ২-এর পাওয়ার কত হলে এর মান ২ টু দি পাওয়ার ৭ হবে। পাওয়ার বলেই দেওয়া আছে। উত্তর ৭ হবে।  $\log_2 2^7 = 7$

এটা অনেকটা মজার কুইজগুলোর মতো। বলো তো, ২০১৮-এর বিশ্বকাপ ফুটবল কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? উত্তর ২০১৮। সবাই হাসল।

তৃষ্ণ বলল, আবার দেখো,  $\log_2 a = \log_2 2^3 = 3$ ,  $\log_2 b = \log_2 2^4 = 4$

তাহলে,  $\log_2(ab) = \log_2 a + \log_2 b$  মানে হলো

$7 = 3 + 4$ , বা গুণফলের পাওয়ার প্রতিটার পাওয়ারের যোগফল!

এটা জানলে তোমরা এখন ভাগের ব্যাপারটাও ভাবতে পারো, কেন সেখানে বিয়োগ হয়, একইভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে।

আরেকটা জিনিসও দেখানো যায়, কেন লগের ভেতরে থাকা পাওয়ার বাইরে বের হয়ে আসে। পাওয়ারকে গুণ আকারে লিখে, তারপর গুণ থেকে যোগ বানিয়েই বুকে ফেলা যায়।

$$\log_2(a^3) = \log_2(a \times a \times a) = \log_2 a + \log_2 a + \log_2 a = 3 \log_2 a$$

লগের ভেতর পাওয়ার থাকলে  
বাইরে বেরিয়ে আসে কেন?

ও হাত তুলল। তৃঢ় বুঝে গেছে ও কী বলবে, কী, এই লগ কই কাজে  
লাগে, এ দিয়ে কী হয়, সেটাই তো জানতে চাও, না?

চিনা একটু লজ্জা পেয়ে বলল, জি ভাইয়া, এটা দিয়ে কী লাভ?

লাভ অনেক। ইংরেজি বৰ্ণমালায় a, b, c, d যেমন গুৱাত্তপূৰ্ণ গণিতে  
লগও তাই। এই অপারেশনগুলো হলো গণিতের একেকটা ভিত্তিপ্রস্তর।  
এগুলোৱ ওপৰ দাঁড়িয়ে আছে গণিত। আচ্ছা বলো তো ১০ ভিত্তিক লগ  
১০০০০০০-এর মান কত।

### লগ দিয়ে অঙ্কসংখ্যা বের কৰা

চিনা বুঝে গেছে লগের ব্যাপারটা।  
ও বলল,  $\log_{10} 1000000$  মানে হলো

১০-এর পাওয়ার কত হলে এর মান  
১০০০০০০ হবে। এখানে ছয়টা শূন্য দেখা যাচ্ছে, তার মানে পাওয়ার  
হতে হবে ৬।  $\log_{10} 1000000 = 6$ ।

বাহ, একইভাবে  $\log_{10} 10000000 = 7$ । এখন যদি তুমি জানো একটা  
সংখ্যার ১০ ভিত্তিক লগারিদম ৬.৩, তুমি সংখ্যাটা না বের করেই বলতে  
পারবে যে সেটা ১০০০০০০ থেকে ১০০০০০০০-এর মধ্যে অবস্থিত।  
আর এদের ভেতরে অবস্থিত হওয়ার মানে সংখ্যাটাতে নিশ্চয়ই ৭টা  
ডিজিট বা অঙ্ক আছে। একইভাবে লগ-এর মান ২.৬ মান হলো—  
সেটা ১০০ আৰ ১০০০-এর মধ্যে অবস্থিত আৰ তাতে ৩টা অঙ্ক আছে।  
দেখো, লগের মান ৬.৩ হলে অঙ্ক সংখ্যা ৭টা, লগের মান ২.৬ হলে  
অঙ্ক সংখ্যা ৩টা। আচ্ছা বলো তো লগ-এর মান ৩ হলে অঙ্ক সংখ্যা  
কয়টা?

চিনা বলল, লগ-এর মান ৩, মানে সংখ্যাটা আসলে ১০০০। তাহলে  
সেখানে অঙ্ক আছে ৪টা।

গুড়। তাহলে লগের মানে দশমিকের আগে যে পূর্ণসংখ্যাটা থাকবে,  
তার এক বেশি হবে অঙ্ক সংখ্যা।

এবাবে ধৰো, তোমাকে আমি বলেই দিলাম  $\log_{10} 2 = 0.301$ , বলো দেখি  
২<sup>৬০</sup>-এর ভেতরে কতগুলো অঙ্ক আছে।

এটা বের কৰতে হলে, আমাদের ১০ ভিত্তিক লগ নিতে হবে—  $\log_{10} 2^{63} =$   
 $63 \times \log_{10} 2 = 63 \times 0.301 = 18.96$ , তাহলে এখানে  $(18+1) = 19$ টা  
অঙ্ক আছে।।

আমাদের সংখ্যাব্যবস্থা যেহেতু ১০ ভিত্তিক, তাই ১০ ভিত্তিক লগারিদম  
খুব ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া কম্পিউটারে ২ ভিত্তিক সংখ্যা নিয়ে কাজ  
হয়, সেখানে ২ ভিত্তিক লগ লাগে। আৱ ক্যালকুলাসেৱ জগতে একটা  
হয়, এই মানে ২.৭১৮২৮১৮...। e ভিত্তিক লগকে  
গুৱাত্তপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া হলো e, যাৱ মান ২.৭১৮২৮১৮...। e ভিত্তিক লগকে  
প্ৰথম বৰ্ণগুলো নিয়ে এটাকে লেখা হয় ln।

আবাৱ ১০-এর ভিত্তিৰ কথা বলি। আজকাল  
আমোৱা ভূমিকম্পেৱ ভয়ে থাকি প্ৰায়ই। **লগেৱ আৱেক ব্যবহাৰ**  
আমোৱা ভূমিকম্পেৱ ভয়ে থাকি প্ৰায়ই। এই  
তোমোৱা হয়তো শুনবে ভূমিকম্পেৱ মাত্ৰা রিখ্টাৰ ক্ষেলে ৬। এই  
রিখ্টাৰ ক্ষেল আসলে log-এৱ হিসাব ক্ষেল। মানে কী জানো? মানে  
হচ্ছে যখন বলে যে রিখ্টাৰ ক্ষেলে এৱ মান হচ্ছে ৬। আসলে এটাৰ  
মান ৬ না। এটাৰ আসল মান দশ লক্ষ (১০০০০০০)। তাৱ মানে  
রিখ্টাৰ ক্ষেলে যখন এৱ মান ৬ থেকে ৭ হয়ে যাচ্ছে, তখন এটাৰ মান  
শুধু ১ বাড়ে না, দশ গুণ বেড়ে যায় আসলে।

দেখ ৬ হওয়া মানে ১০০০০০০ এবং ৭ হওয়া মানে ১০০০০০০০।  
রিখ্টাৰ ক্ষেলে যদি ৭ থেকে ৮ হয় সেটা আৱ দশ গুণ বেড়ে যায় এবং  
এটা যদি ৯ হয়, সেটা আৱ দশ গুণ বেড়ে যায়।

আৱেকটা ব্যাপার দেখো এত বড় বড় সংখ্যাকে লগ দিয়ে কত ছোট  
কৰে ফেলা যায়। এ জন্য শৰ্কেয় মুহম্মদ জাফৱ ইকবাল স্যার তাৱ  
'গাণিতিক বাতচিত' নামে একটা লেখায় মজা কৰে বলেছিলেন, কাউকে  
যদি গাণিতিকভাবে ঝাড়ি দিতে চাও তাহলে তাকে বলবে, এই... বেশি  
হৰ্ষিতমৰি কৰলে তোকে লগ কৰে ছেড়ে দেব!

**পৃষ্ঠী জিজ্ঞেস কৰল, লগেৱ ভিত্তি কি ঝণাঅক  
হতে পাৱে? স্যার বলেছে, পাৱে না। কিন্তু** **লগেৱ ভিত্তি কি ঝণাঅক  
হতে পাৱে?**

তৃ্য বলল, সুন্দর প্রশ্ন! আমাদের চেনা বাস্তব সংখ্যার লগারিদমে এদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, কারণ দেখো -৮-এর জন্য যদিও পেলে, ৮-এর জন্য কিছু পাবে না! -২ ভিত্তিক অধিকাংশ মান বাস্তব সংখ্যায় পাওয়া যাবে না! বাস্তব সংখ্যায় এ-জাতীয় লগের একটা সুসংজ্ঞায়িত ব্যবস্থা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এড়িয়ে চলে সবাই।

তবে এ ধরনের লগারিদমেরও আসলে অস্তিত্ব আছে, যাকে বলে কমপ্লেক্স লগারিদম!

**ক্যালকুলেটর ছাড়া কি  
লগের মান বের করা যায়?** ভাইয়া, লগারিদমের মান ক্যালকুলেটর ছাড়া বের করার উপায় কী? যেমন মনে করেন  $\log_{10}(.056)$ -এর মান কীভাবে বের করব?

তৃ্য বলল, এটার জন্য এইচএসসির জ্ঞান প্রয়োজন। তবে হালকা ধারণা দিতে পারি।  $x$ -এর মান -১ থেকে ১-এর ভেতরে হলে, e-ভিত্তিক লগের মান বের করা যায় এই ধারা দিয়ে  $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$  এখানে  $x=-0.988$  হলে,  $\ln(1-0.988) = \ln(0.012)$  পাওয়া যাবে।

এরপর লগের ভিত্তি পরিবর্তনের সূত্র দিয়ে ১০ ভিত্তিক বা যেকোনো ভিত্তিক লগের মান বের করা যায়। সূত্রটা হলো  $\log_a c = \log_b c \times \log_b a$ । তোমরা এখন সময় নিয়ে ভাবলে এই লাইনটাও ফিল করতে পারবে। এখানে বলা হচ্ছে পাওয়ারের ওপর পাওয়ার থাকলে সেগুলো গুণ হয়ে যায়, যেমন  $(2^3)^4 = 2^{12}$ । যাহোক তোমরা পরে ভেবো, এখন দেখো, ভিত্তি পরিবর্তনের সূত্র থেকে পাওয়া যায়—

$$\log_{10} a = \log_{10} e \times \log_e a = 0.434 \times \ln a.$$

যদিও মূল ধারাটা বুঝতে পারল না, তবু একটা উপায় যে আছে, এটা দেখেই ওরা খুশি হয়ে গেল। তৃ্য জানে সব সময় বোঝাতে না পারার মধ্যে দোষ নেই।

আমি ওদের কৌতুহল পুরোপুরি মেটাতে না পারি, যেন সেটা জাগিয়ে রাখতে পারি, যেন নষ্ট করে না দিই। কৌতুহলের দরজা খোলা থাকুক সব সময়!

## অধ্যায় ৫

### ফাংশন নিয়ে টেনশন

#### ৫.১

স্কুলে নজিবুল্লাহ সাহেব একটা অভূত ব্যাপার খেয়াল করলেন। কয়েক দিন ধরে ছাত্রছাত্রীরা আর কেউ তাকে কোনো রকম পাতাই দিচ্ছে। আগে ভয়ে ভয়েও দু-একজন প্রশ্ন করত, এখন তাও করছে না। এমনকি সেদিন ক্লাস থেকে ফেরার পথে আড়চোখে লক্ষ করলেন, তবু নীপাকে বলছে, এটা খুব সহজ, আমি তোকে বুঝিয়ে দেব। ওরা কি অন্য কোনো মাস্টারের কাছে পড়তে যাচ্ছে?

অঙ্ক ভাইয়ার ব্যাপারটা জানতে বেশি সময় লাগল না তার। ছোট শহরে কোনো খবরই কারও অগোচর থাকে না। তারপর একদিন তবুকে ডেকে পাঠালেন।

আজকাল নাকি খুব অঙ্ক শেখা হয়? কোথাকার এক চাংড়া ছেলে, তার কাছে পড়তে যাস শুনলাম? ও কিছু জানে?

স্যার, উনি তৃ্য ভাইয়া। বুয়েটে পড়েন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। গণিত অলিম্পিয়াডের সাথে যুক্ত।

হাহ! গণিত অলিম্পিয়াড! একটা পরীক্ষা দিয়ে সারা দিন লাফালাফি— এটা দিয়ে গণিত শেখানো যায়? তবু মনে মনে কষ্ট পায়। সে জানে ব্যাপারটা মোটেই অমন না। মানুষ যেন গণিতকে ভয় না পায়, যেন এটাকে তার সংস্কৃতির অংশ হিসেবে নিতে পারে, তার জন্যই এই

আলিম্পিয়াডগুলোর আয়োজন করা হয় উৎসবের মতো করে। স্যারকে  
কিছু বলতে পারে না ভয়ে।

সাহস থাকলে তারে বলবি আমার সাথে দেখা করতে, দেখব কত বড়  
অঙ্কের জাহাজ সে!

৫.২

সেই দিন সন্ধ্যায় কথা প্রসঙ্গে নজিবুল্লাহ স্যারের কথা তুলল তবী।  
স্যার তৃর্যের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন শুনে সেও বেশ উত্তেজিত  
বোধ করল। পরদিন স্যারের সাথে কথা বলে তবী ঠিক করল পরের  
সোমবার তৃর্য দেখা করতে যাবে তার সাথে।

এর মাঝে তৃর্য খেয়াল করল নজিবুল্লাহ স্যার সম্পর্কে তার ধারণা সব  
ঠিক না। ও টিনাদের ক্লাসের বইয়ের অনুশীলনী সমাধান করাছিল। সে  
লক্ষ করল, নজিবুল্লাহ স্যার যদিও প্রশ্ন করতে দেন না, বাড়ি দেন কথ্য  
ভাষায়। কিন্তু বইয়ের অঙ্কগুলো কীভাবে করতে হয়, সেটা কঠিনভাবে  
শেখান। ফলে ছেলেমেয়েরা এসএসসিতে সবাই ভালো করে কিন্তু  
আসলে ভেতর থেকে কিছু শেখে না। তবু যেহেতু ওরা অঙ্কগুলো ভালো  
পারে, এতে তৃর্যের বেশ সুবিধাই হলো শেখাতে।

তৃর্য আরও খেয়াল করল, স্যারের অঙ্ক করানোর ধরনটা খুব গোছানো।  
যুক্তি সাজানোটাও সুন্দর। টিনাদের কাছ থেকে জানল, স্যার কখনো  
ওদের জোর করেন না তার কাছে প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার জন্য।  
অন্য একটা স্কুলের অঙ্ক স্যার নাকি তার কাছে প্রাইভেট না পড়লে  
যাই লিখুক ফেল করিয়ে দেয়। সেই তুলনায় নজিবুল্লাহ মাস্টার অনেক  
ভালো। তা ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের যতই বাড়ি দিন, ওদের দরকারেও  
সাহায্য করেন তিনি।

এটা জেনে একটা সমস্যা হলো তৃর্যের— একই মানুষের এত চেহারা  
হলে তার সাথে কীভাবে কথা বলে। সে ভেবেছিল স্যারকে কিছু কথা  
শুনিয়ে দেবে। কিন্তু মানুষ চরিত্র এত বেশি জটিল! গণিত দিয়ে হিসাব  
মেলে না তৃর্যের।

৫.৩

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওরা যখন পড়তে এল,  
তৃর্যের অঙ্ক করাতে ভালো লাগছিল না তখন।  
ও বলল, ‘আজ ক্লাসের অঙ্ক না। বাইরের কিছু বোবাব। বলো, তোমরা  
কী জানতে চাও? এখন মঞ্চ তোমাদের। তোমরা আমাকে যা খুশি  
জিজেস করতে পারো।

তৃর্য ভেবেছিল আজকে তার ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন গুলো হবে এমন  
পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বিষয় নিয়ে। কিন্তু টিনা বলে বসল, ভাইয়া, আর  
কয়দিন পর টেস্ট পরীক্ষা। এখনো ফাংশন বুঝি না। তৃর্য হাসল, আচ্ছা  
ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। সব সময় যেভাবে চাইব, সেটাই ঘটবে  
এমন কোনো কথা নাই।

ফাংশনের বাংলা হলো কাজ। আমার কাছে মনে হয় এটা একটা  
মেশিনের মতো, কিছু একটা দিলে কিছু একটা পাওয়া যাবে। যেমন  
জুস বানানোর মেশিন। আপেল ছেড়ে দেবে, জুস বের হবে। এখানে  
আপেল হলো ইনপুট আর জুস হলো আউটপুট। গণিতে আমরা যখন  
লিখি  $f(x)=x^2$

এর মানে হলো এটা এমন একটা যন্ত্র যেখানে  $x$  দিলে বের হবে  $x^2$ ,  
মানে যাকেই দেবে তাকে যন্ত্রটা বর্গ করে ছেড়ে দেবে।

এইটা তো বুঝি কিন্তু ডোমেন রেঞ্জ কী জিনিস?

ও আচ্ছা। দেখো, এই যে আমি বললাম, ফলের জুস বানানোর মেশিন।  
এখানে তুমি যা খুশি তা-ই ইনপুট দিতে পারো? কমলা দাও, আপেল  
দাও, কলা দাও, ভালো— কিন্তু যদি একটা পাথর ছেড়ে দাও, তাহলে?  
তোমার যন্ত্রের দফারফা। বুঝতেই পারছ ওসব দেওয়া যাবে না।

তো একটা যন্ত্রে যা যা তুমি দিতে পারো, সেটার সেট হলো ডোমেন,  
আর যা যা পাওয়া যায় সেটা হলো রেঞ্জ। আমাদের এই ফাংশনটাকে  
লেখা যায় এভাবে

$$f(\text{ফল}) = \text{ফলের জুস}$$

ফাংশন দিয়ে কী হয়?

এটার মধ্যে আপেল, কমলা, আম দিলে হবে—

$f(\text{আপেল})$  = আপেলের জুস

$f(\text{কমলা})$  = কমলার জুস

$f(\text{আম})$  = আমের জুস

এখানে ফাংশনটার ডোমেন হবে {আপেল, কমলা, আম,...} রেঞ্জ হবে {আপেলের জুস, কমলার জুস, আমের জুস,...}

$f(\text{পাথর})$  কী হবে?

অসংজ্ঞায়িত!

তবে ফাংশনের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে, একটা ইনপুটের আউটপুট সব সময় একটাই পাওয়া যাবে। আপেল ইনপুট দিলে একবার আপেলের জুস, একবার কমলার জুস এমনটা কখনো পাবে না। একেকবার একেক উত্তর দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ একটা প্রশ্নের একাধিক উত্তর হওয়া চলবে না।

অবশ্য একাধিক প্রশ্নের একই উত্তর হতে পারে। যেমন ধরো, তোমার উচ্চতা মাপার মেশিন একটা ফাংশন। মেশিন যদি ঠিক থাকে, তোমার উচ্চতা একটাই আসবে, একেকবার একেকটা আসবে না। আবার তোমার একটা বন্ধু থাকতেই পারে, যার উচ্চতা তোমার সমান। তোমাদের দুজনের জন্যই একই মান আসবে তখন। তাতে অসুবিধা নাই।

গণিতিক ফাংশন দিয়ে বললে,  $f(x)=x^2$  এখানে তুমি ২ ইনপুট দিলে সব সময় ৪ ই পাবে। কখনো আর অন্যকিছু পাবে না। -২ দিলেও ৪ পাবে। একাধিক ইনপুটের একই আউটপুট হতে পারে, তবে যা-ই ইনপুট দাও যেন একাধিক আউটপুট না হয়।

এবার প্রশ্ন করল পৃথীৱী, ভাইয়া, পরমমানের

কিছু সমস্যায় দেখেছি পরমমান ওঠানোর  
পরে প্লাস-মাইনাস চিহ্ন দেওয়া লাগে।

তাহলে দুইটা মান হয়ে গেল না?

তৃতীয় বলল, যখন প্রথম দেখেছিলাম এটা নিয়ে আমারও দ্বিদ্বা ছিল, একটু ভাবতেই বুবো গেছি তুম। এটা নিশ্চয়ই জানো যে পরমমান আসলে মূলবিন্দু থেকে দূরত্ত নির্দেশ করে। তাই এটা সব সময়ই ধনাত্মক হয়।

এখন আমাকে অন্য একটা প্রশ্নের উত্তর দাও— একটা রাশির সামনে মাইনাস চিহ্ন থাকলে সেটা কি ঝণাত্মক হবেই?

সবাইকে বিভ্রান্ত দেখাল, তাই তো হওয়ার কথা।

উহু, উত্তর হলো— না!

যেমন ধরো  $-x$ ; এখানে  $x$  যদি নিজেই ঝণাত্মক হয়? ধরো  $x$  এর মান  $-8$ , তাহলে  $-x$  এর মান কত হবে?  $-(-8) = 8$ ; এটা কিন্তু ধনাত্মক! তার মানে আমরা বলতে পারি,  $x$  যদি নিজে ঝণাত্মক হয় তাহলে  $-x$  হবে ধনাত্মক!

এবার বলো,  $x$  যদি নিজে ঝণাত্মক হয় তখন  $|x|$ -এর মান কত? উত্তর হলো  $-x$ ;  $x$  তো নিজে ঝণাত্মক, তার সামনে মাইনাস বসিয়ে এটাকে ধনাত্মক বানানো হয়! ফলে পরমমানের মান কিন্তু ধনাত্মকই থাকল!

$$|-4| = -(-4) = 4;$$

এটুকু বুঝলে এখন পরমমানের এই সংজ্ঞাটা বুঝতে পারার কথা

$$|x| = x, \text{ যখন } x \geq 0$$

$$= -x, \text{ যখন } x < 0$$

$x$ -এর মান ধনাত্মক বা শূন্য হলে পরমমানের মান সেটাই হবে!  $x$ -এর মান ঝণাত্মক হলে সামনে মাইনাস বসিয়ে ওটাকে ধনাত্মক বানাতে হবে। এবার পরমমানের ভেতরে একটা রাশির কথা ভাবো। ধরো,  $|2x-4|$ । যেহেতু ভেতরে একটা চলক আছে, সরাসরি এটার মান আমরা বলতে পারব না! যদি ভেতরের রাশিটা মানে  $2x-4$  ঝণাত্মক হয়, তাহলে উপরের সংজ্ঞা থেকে বলা যায়—

$$|2x-4| = -(2x-4);$$

কিন্তু  $2x-4$  কখন ঝণাত্মক হবে? যখন  $2x-4 < 0$ , বা,  $2x < 4$ , বা,  $x < 2$

একইভাবে, যদি ভেতরের রাশিটা মানে  $2x-4$  ধনাত্মক বা শূন্য হয়, তাহলে  $|2x-4| = (2x-4)$ ;

তার মানে এটা হবে যখন  $2x-4 \geq 0$ , বা,  $2x \geq 4$ , বা,  $x \geq 2$

$$\begin{aligned} \text{অর্থাৎ } |2x-4| &= 2x-4, \text{ যখন } x \geq 2, \\ &= -(2x-4), \text{ যখন } x < 2 \end{aligned}$$

মনের শান্তির জন্য  $x$ -এর মান ২-এর চেয়ে ছোট যেমন ১ বসিয়ে দেখতে পারো!  $-(2 \times 1 - 4) = -(-2) = 2$

পরমমানের মান ধনাত্মকই থাকল!

$\sqrt{4} =$  কত?  $+2, -2$  নাকি  $\pm 2$  তবী জিজেস করল, আচ্ছা ভাইয়া, প্লাস-মাইনাসের কথা শুনে মনে পড়ল:  $\sqrt{4}$ -এর মান আসলে কত? সাধারণভাবে তো সব জায়গায় ধনাত্মক মানটাই লেখা থাকে দেখি। কিন্তু root-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী তো  $\pm 2$  হওয়া উচিত। আমি তো বুঝি  $\sqrt{4}$  মানে হলো কাকে বর্গ করলে 4 পাওয়া যায়। আবার  $x^2 = 4$  হলে তখন দেখি  $x = \pm 2$  ই লেখা থাকে... ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে দেবেন?

তৃষ্ণ বলল,  $\sqrt{4}$ -এর মান আসলে শুধু  $+2$ । এটা হলো ‘ $\sqrt{\cdot}$ ’ এই ফাংশনটার ব্যাপার। মনে আছে, বলেছিলাম, ‘ফাংশন’-এর সংজ্ঞায় আছে— একাধিক আউটপুট হওয়া যাবে না? সেটা মানতে এখানে একটা মানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটাকে বলে Principal Square Root বা প্রধান বর্গমূল। এটার সংজ্ঞা এমন:

$$\sqrt{(a^2)} = |a|, a \in R.$$

$$\text{ফলে } \sqrt{4} = \sqrt{(2^2)} = |2| = 2$$

আবার  $-2$  ব্যবহার করেও লেখা যায়,  $\sqrt{4} = \sqrt{(-2)^2} = |-2| = 2$ । দুটো ক্ষেত্রেই পাব ২। তোমার কথা ঠিক যে ৪ এর বর্গমূল দুইটা; কিন্তু এর ‘প্রধান বর্গমূল’ আছে একটা। আর সেটাকেই লেখা হয়  $\sqrt{\cdot}$  প্রতীকটা দিয়ে।

আবার দেখো  $x^2 = 4$  হলে আমরা  $x$ -এর দুইটা মান পাব! সেটার হিসাবটা করা হবে এভাবে—

$$\begin{aligned} x^2 &= 4 \\ x^2 &= (\sqrt{4})^2 \\ x^2 - (\sqrt{4})^2 &= 0 \\ (x + \sqrt{4})(x - \sqrt{4}) &= 0 \\ x = \sqrt{4} \text{ অথবা } x &= -\sqrt{4} \end{aligned}$$

$$x = 2 \text{ অথবা } x = -2$$

খেয়াল করো  $\sqrt{4}$ -এর মান কিন্তু শুধু ২-ই ব্যবহার করা হয়েছে!

তৃষ্ণ বান্টির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল,  $\sqrt{\cdot}$  প্রতীকটা কোথেকে এসেছে জানো নাকি?

কোথেকে?

ইংরেজি আর লাতিনে এমন মূল বের করাকে বলে radix। বিখ্যাত গণিতবিদ লিওনার্ড অয়লারের মতে, এই  $\sqrt{\cdot}$  প্রতীকটা এসেছে সে radix শব্দের প্রথম অক্ষর  $r$  থেকে!

এ সময় তবী তার ব্যাগ থেকে একটা বই বের করল। ওখানে লেখা আছে, কী করে দুই আর দুই পাঁচ প্রমাণ করা যায়! ও প্রমাণটার বামেলা কোথায় সেটা জানতে চাইল—

$$-20 = -20$$

$$16 - 36 = 25 - 45$$

$$16 - 36 + \left(\frac{81}{4}\right) = 25 - 45 + \left(\frac{81}{4}\right)$$

$$8^2 - 2 \times 8 \times \left(\frac{9}{2}\right) + \left(\frac{9}{2}\right)^2 = 5^2 - 2 \times 5 \times \left(\frac{9}{2}\right) + \left(\frac{9}{2}\right)^2$$

$$\left(8 - \frac{9}{2}\right)^2 = \left(5 - \frac{9}{2}\right)^2$$

$$\left(8 - \frac{9}{2}\right) = \left(5 - \frac{9}{2}\right)$$

$$8 = 5$$

$$2 + 2 = 5$$

ভাইয়া এখানে সমস্যাটা কোথায়?

তৃর্য দেখিয়ে দিল, বর্গ যেখানে তুলে দেওয়া হয়েছে সেটা ভুল।  $a^2=b^2$  হলেই  $a=b$  হবে এটা সত্য না। যেমন  $(-2)^2=2^2$  তার মানে এই না যে  $-2$  আর  $2$  সমান। বর্গ তোলার সঠিক রীতি হলো পরমমান ব্যবহার করা।  $a^2=b^2$  হলে  $|a|=|b|$

$(8 - \frac{1}{2})^2 = (5 - \frac{1}{2})^2$  এর পরের লাইন হবে  $|8 - \frac{1}{2}| = |5 - \frac{1}{2}|$  তাহলে ঠিক আছে। এখান থেকে পাবে,  $|- \frac{1}{2}| = |\frac{1}{2}|$  বা,  $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ , কোনো বামেলা নাই আর।

টিনা দুশ্চিন্তা নিয়ে বলল, ভাইয়া, আবার কি একটা ফাংশনের অঙ্ক দেখাতে পারি?

তৃর্য রাগের মতো করে বলল, না, এতক্ষণ যখন ফাংশন পড়াছিলাম তখন কই ছিলে? এখন আর ফাংশন না। টিনা মন খারাপ করে মুখ নিচু করতেই তৃর্য হেসে উঠল, আরে ধূর! মজা করলাম একটু। আমি কি নজিবুল্লাহ মাস্টার নাকি? মাথায় প্রশ্ন সব সময় নিয়ম ধরে আসে না। যখন যা মাথায় আসবে জিজেস করতে থাকবে। কোনো অসুবিধা নাই।

টিনা যেন জানে পানি পেল, সেও বুবাতে পারছিল না, ভাইয়া হঠাৎ রাগবে কেন?

**$f(x) = x^2$  কি এক-এক ফাংশন?**

আমাদের বইয়ে  $f(x) = x^2$ -কে এক-এক ফাংশন হিসেবে দেখাতে বলা হয়েছে। প্রশ্নটা কি ঠিক?

এটি নির্ভর করবে ফাংশনটার ডোমেন কী দেওয়া আছে তার ওপর! তোমাদের তখন আমি বলেছিলাম রেঞ্জের কথা। আসলে একটা ফাংশন যখন সংজ্ঞায়িত করা হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তার ডোমেন দিয়েই দেওয়া থাকে। দেখবে এভাবে লেখা হয় প্রায়ই।  $f: R \rightarrow R^+$ , এ রকম থাকলে  $f$  দিয়ে বোঝায় ফাংশনটার নাম। এরপর তীর দিয়ে দেখানো হচ্ছে ফাংশনটা কোথা থেকে কোথায় ‘ম্যাপ’ হচ্ছে। তীরের আগেরটা হলো ডোমেন। পরেরটা কিন্তু রেঞ্জ না, সেটাকে বলে কোডোমেন।

পার্থক্যটা কী ভাইয়া?

কোডোমেনের ভেতর গণহারে সবাই থাকে, রেঞ্জ তার একটা উপসেট। যেমন ধরো, তোমার ক্লাসের সবার উচ্চতা। এটা

কিন্তু একটা ফাংশন। সে ফাংশনটার ইনপুট হলে তোমরা, আউটপুট

একেকটা সংখ্যা। ধরো ফাংশনটাকে এভাবে লিখলাম—

$h: \text{Student} \rightarrow R^+$

$h(\text{Mr. X}) = \text{height of Mr. X}$

দেখো এটার মানে হলো— এখানে ডোমেন হলো ছাত্রছাত্রীরা। আর  $R^+$  ফাংশনটা তাদের উচ্চতা বের করে। কোডোমেন  $R^+$  থেকে বোঝা যায় উচ্চতাটা হবে ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা। মানুষ যদি থাকে উচ্চতা নিশ্চয়ই শূন্য হবে না, অগাত্মক তো নয়ই। এই  $R^+$  কোডোমেনটা বলে উচ্চতার মান কেমন হবে। এখন বলো তো  $R^+$  এর ভেতরে কতগুলো বাস্তব সংখ্যা আছে?

‘লাখ লাখ’

‘কোটি কোটি’

‘অসীম সংখ্যক’

হ্যাঁ, এইবার ঠিক আছে। কিন্তু একটা ক্লাসে যদি ৪০ জন ছাত্রছাত্রী থাকে, উচ্চতা কত রকমের হতে পারে? সর্বোচ্চ ৪০ রকমের, তাই না? তার মানে এত যে ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা তারা সবাই কিন্তু এই ক্লাসের উচ্চতা না। উচ্চতাগুলোর সেট আসলে একটা ছোটি সেট, আর সেটা হলো  $R^+$  এর উপসেট। যেই সংখ্যাগুলো সত্যি সত্যি এই ক্লাসের উচ্চতা প্রকাশ করে, শুধু তারা হলো রেঞ্জ। আর রেঞ্জসহ বাকি সবাই হলো কো-ডোমেন।

তবী বলল, কিন্তু ভাইয়া, রেঞ্জ কি কো-ডোমেনের সমান হতে পারে না? মনে করেন—

কোডোমেন আর রেঞ্জের পার্থক্য কী?

$$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$f(x) = x^2$$

এখানে কোড়োমেনে যারা আছে তাদের প্রত্যেকেই তো ডোমেনের কোনো না কোনো সংখ্যার বর্গ? কোড়োমেনের প্রত্যেককেই কখনো না কখনো আউটপুট হিসেবে পাওয়া যাবে।

**সার্বিক ফাংশন কী?** যখন রেঞ্জ আর কোড়োমেন সমান হয়ে যায় তখন ফাংশনটাকে বলে সার্বিক ফাংশন।

এবারে টিনা মুখ খুলল, ভাইয়া, আমার প্রশ্নটার তো উত্তর দিলেন না।  
 $f(x) = x^2$  কি এক-এক?

হ্যাঁ এবার সেটাও বোঝাব। মনে আছে তোমাদের বলেছিলাম, ফাংশনে কোনো একটা ইনপুটের আউটপুট হবে শুধু একটা? কিন্তু অনেকগুলো ইনপুটের কিন্তু একই আউটপুট হতেই পারে।  $f(x) = x^2$  এ রকম একটা ফাংশন। এখানে ২ দিলেও পাবে চার, -২ দিলেও চার। কিন্তু কিছু ফাংশন আছে যেগুলো আলাদা আলাদা মান দিলে তুমি সব সময় আলাদা মানই আউটপুট পাবে। যেমন  $f(x) = x^3$ , এখানে দুই দিলে পাবে আট। অন্য কোনো সংখ্যা ইনপুট দিয়ে তুমি আর আট পাবে না। একটার জন্য ঠিক একটা আউটপুট। এ রকম হলে তখন বলে এক-এক ফাংশন। যেমন  $f(x) = x^3$  একটা এক এক ফাংশন এবং সাধারণভাবে চিন্তা করলে  $f(x) = x^2$  এক এক ফাংশন নয়।

কিন্তু একটা ছোট ফাঁকি রয়ে গেছে। ফাংশনটা কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা আছে, সেই ডোমেন আর কোড়োমেন কিন্তু আমরা লিখিনি। খেয়াল করো, যদি আমরা এভাবে লিখি—

$$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$f(x) = x^2$$

আমরা ডোমেনটা নির্ধারণ করে দিলাম শুধু ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা। এবারে কিন্তু তুমি ধনাত্মক সংখ্যা দিতেই পারছ না। এবারে বর্গ সংখ্যা ৪ শুধু একভাবেই পাবে, ২ ইনপুট দিলে। তার মানে এভাবে সংজ্ঞায়িত

করলে ঠিক একটার জন্য একটা মান পাওয়া যাবে।

গাণিতিকভাবে বললে, ডোমেইনের প্রতিটা ভিন্ন মানের জন্য ফাংশনের ভিন্ন ভিন্ন মান পাওয়া যাবে। তখন এটা এক এক ফাংশন হবে।

সবাই একটু সময় নিল ব্যাপারটা আরেকবার বুঝে নিতে।

পরের প্রশ্নটাও তবীর, ভাইয়া, অসীম আর শূন্য গুণ দিলে কী হয়?  
 তৃষ্য সংক্ষেপে বলল, এটা একটা অনি�র্ণয় আকার।

কেন, ভাইয়া? একটা শূন্য হোক আর  
 এক শটা শূন্য হোক, সবাই যদি শূন্য হয়,  
 অসীম পরিমাণ শূন্যও কি শূন্যই হবে

**অসীম আর শূন্য গুণ দিলে  
 শূন্য হয় না কেন?**

না? তাহলে অসীম গুণ শূন্য কেন শূন্য নয়? বেশি বাচ্চাদের মতো  
 প্রশ্ন হচ্ছে? অসংজ্ঞায়িত, অনির্ণয়— এগুলো প্র্যাচ খেয়ে যায়। একটু  
 বোঝাবেন?

তৃষ্য বলল, আচ্ছা আগে অসীম আর শূন্যের গুণফলের ব্যাপারটা বলি।  
 অসীম কিন্তু কোনো সংখ্যা নয়, এটা একটা গাণিতিক ধারণামাত্র।  
 এটাকে দিয়ে সরাসরি গুণ ভাগ করা যায় না, লিমিটের ধারণা ব্যবহার  
 করতে হয়! তোমাদের কি লিমিট বা সীমা সম্পর্কে ধারণা আছে? ওরা  
 মাথা নাড়ল। এটা আছে এইচএসসিতে।

তৃষ্য ভাবল ওদের একটু ধারণা দেওয়া সম্ভব।  
 ও বলল, ফাংশনে চলকের মান বসাতে থাকলে  
 মাঝে মাঝে এমন কিছু সময় আসে, যখন তুমি বুঝবে কী আসতে  
 যাচ্ছে, অথচ গণিত দিয়ে দেখাতে পারবে না। সেসব ক্ষেত্রে লিমিট  
 দারণ সহায়ক। একটা ফাংশন দেখাই তোমাদের—

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

এই ফাংশনে  $x$ -এর মান ৩ হলে ফাংশনটার মান কত হবে? ৩ বসালে  
 ওপরেও শূন্য এসে পড়ে, নিচেও শূন্য এসে পড়ে। ০/০-এর মান  
 কত সেটা আমরা বলতে পারি না। কারণটা বোঝা কঠিন নয়। ১৫/৩  
 কথাটার মানে হলো ৩ কে কত দিয়ে গুণ করলে ১৫ হয়। কত দিয়ে?

দিয়ে। তাহলে  $15/3=5$ ।

২৪/৮ মানে হলো ৪-কে কত দিয়ে গুণ দিলে ২৪ হয়। সেটা কত? ৬।  
তাহলে  $24/8=6$ । তাহলে ০/০ মানে হলো ০-কে কত দিয়ে গুণ দিলে  
০ হয়। এখন, ০-কে ১ দিয়ে গুণ করলেও ০ হয়, ২ দিয়ে গুণ করলেও  
শূন্য হয়, এমন ৩, ৪, ৫, ৬ যা দিয়েই গুণ করা যাক, শূন্যই হয়।  
তাহলে ০/০ এর মান ১, ২, ৩, ৪, ৫ ... সবকিছুই হতে পারে!  
পৃথী বলল, বাহ, ভালো তো!

**অনিশ্চয় আকার কোনগুলো?** এর মান কত আমরা নিশ্চিত করে  
বলতে পারছি না। এমন ০/০-  
বলে অনিশ্চয় (Indeterminate form)। এ রকম অনিশ্চয় আকার  
আরও বেশ কিছু আছে যেমন,  $0^0$ ,  $1^\infty$ ,  $\infty - \infty$ ,  $\infty \div \infty$ ,  $0 \times \infty$  এবং  
 $\infty^0$ । এরাও আসলে অনেক রকম মান দেয়। অনিশ্চয় আকারগুলোর  
বৈশিষ্ট্যই এটা— এরা অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়, এই মান দেব, ওই মান  
দেব, সেইটা দেব।

রাজনীতিবিদদের মতো?

হা হা, অনেকটা ওরকমই। কিন্তু ফাংশনের কথা মনে করো, আউটপুট  
হতে হবে একটা, না হলে জিনিসটা সংজ্ঞায়িত হবে না। অনিশ্চয়  
আকারগুলোর সব কয়টা এ কারণে অসংজ্ঞায়িত।

তার মানে কি অনিশ্চয় মানেই অসংজ্ঞায়িত?

নাহ, অনিশ্চয়গুলোকে ভাবতে পারো অসংজ্ঞায়িতদের একটা উপসেট।

অসংজ্ঞায়িত আকার আছে অজস্র।  $1/0$ ,  $2/0$ ,  $0/0$ ,  $\log 0$ ,  $\log 5$ ,  
এমন অনেকে আছে যারা সবাই অসংজ্ঞায়িত। তাদের ভেতর মাত্র  
সাতটা আছে, যারা অনিশ্চয়, এরা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটু আগে  
তাদের সবার পরিচয়ই দিয়েছি। এরা একটু স্পেশাল কারণ লিমিট  
ব্যবহার করে অনেক সময়ই এদের ভেতর থেকে তথ্য পাওয়া যায়,  
এদের আসল মান কেমন সেটা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

যাহোক আমরা আমাদের ফাংশন  $f(x)=(x^2-9)/(x-3)$ -এর কাছে ফিরে  
যাই। আমরা দেখতে পেলাম  $x$ -এর মান যখন ৩, তখন এই ফাংশন  
আমাদের ০/০ এমন একটা অনিশ্চয় আকার দিচ্ছে। কিন্তু এটার মান  
কত হলে সবচেয়ে ভালো হতো সেটা কী ছিল করা যায়? চলো চেষ্টা  
করে দেখি। ৩ তো ইনপুট দিতে পারিনা, তা এর খুব কাছাকাছি কোন  
মান দিয়ে দেখি কত পাওয়া যায়। আমরা দেখি,

$$f(2.999)=5.999$$

$$f(2.9999)=5.9999$$

$$f(3.001)=6.001$$

$$f(3.00001)=6.00001$$

অর্থাৎ  $x$ -এর মান ৩-এর কাছাকাছি কিছু দিলে পুরো ফাংশনের মানটা  
৬-এর কাছাকাছি থাকছে! আমরা ৩ একটু আগে থেকে শুরু করে  
২.৯৯৯, ২.৯৯৯৯ এভাবে যত ৩-এর দিকে আগাচ্ছি, পুরো ফাংশনের  
মানটা ৫.৯৯৯, ৫.৯৯৯৯ এভাবে ৬-এর দিকে আগাচ্ছে। আবার  
৩-এর একটু পর থেকে শুরু করেও যদি ৩.০০১, ৩.০০০০১ এভাবে  
আমরা একটু করে করে করে করে করে ৩-এর দিকে সরে আসি, পুরো ফাংশনের  
মানটা করে করে করে করে ৬-এর দিকেই যাচ্ছে!

এখন আমরা বুঝতে পারছি  $x$ -এর মান ৩ হলে ফাংশনটার মান কত  
হওয়া উচিত ছিল। নিশ্চয়ই ৬। কিন্তু সেটা হতে পারছে না, কারণ  
ওপরে-নিচে শূন্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই যে আমরা বুঝতে পারছি যে  
এটা আর কেউ না ৬-এর দিকেই আগাচ্ছে, এটাকে তো গণিতবিদেরা  
অস্বীকার করতে পারেন না! তাই তারা নতুন এক গণিতের জন্ম দিলেন।  
আবিষ্কৃত হলো লিমিট।

এবার তারা লিখলেন এভাবে—

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$$

এর মানে হলো  $x$ -এর মান যখন ৩-এর ‘খুড়ে উঠে কাছাকাছি’ পৌছাবে  
তখন  $(x^2-9)/(x-3)$  ফাংশনটার মান যার ‘খুড়ে উঠে কাছাকাছি’ পৌছাবে  
সে হলো ৬। এ কথাটা খুব নিরাপদ কথা। আমরা জানি  $x$ -এর মান

রিসার ও দেওয়া যায় না, অনিশ্চয় হয়ে যায়। ৩-এর খুব কাছাকাছি দিতে তো আর আপত্তি নেই। অর্থাৎ ৩ হলে ফাংশনের মান কত হ্যা, সে বিতকে আমরা যাব না, আমরা ঘুরিয়ে যাব। বলব ইনপুট ৩-এর 'কাছে গেলে' ফাংশনের আউটপুট ৬-এর 'কাছে যাবে'।

### অসীম কি কোনো সংখ্যা?

এবাবে আমার মূল সমস্যায় আসি। অসীম আর শূন্যের গুণফল কীভাবে ভাবব? অসীম তো কোনো সংখ্যা না, এটা একটা ধারণা। এটা বিরাআআআট কিছু একটা। আমরা ঠিক অসীমে কখনো যেতে পারি না। বাস্তব সংখ্যার গণিতে কোনো চলকের মান অসীম বসালেই সবাই খেপে যাবে। কিন্তু... আমরা চলকের মান সরাসরি অসীম না বসিয়ে একটু ঘুরিয়ে খেতে পারি। লিমিট দিয়ে বলতে পারি অসীমের 'দিকে' গেলে কী হবে?

যদি  $n$  সংখ্যক শূন্য পাশাপাশি যোগ করা হয় তার মান কি শূন্য হবে? উত্তর হলো হ্যাঁ! এভাবে ভাবি—

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \times 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

যেহেতু  $n \times 0 = 0$ , এবাব  $n \rightarrow \infty$  হলেও তার মান শূন্যই হবে। এখান থেকে তাকালে তোমার যুক্তিতে আসলেই কোনো ভুল নেই! মনে হবে

অসীম  $\times 0 = 0$ ;

সমস্যাটা কোথায়? সমস্যা হলো যুক্তি শুধু একটাই নয়! ধৰা যাক, দুইটা ফাংশন আছে,  $f(x) = 1/(x+2)$ ,  $g(x) = 4(x+2)$ ; আমি প্রশ্ন করলাম— যখন  $x \rightarrow \infty$  (এটাকে পড়া হয়  $x$  tends to infinity, মানে  $x$  যখন অসীমের খুব কাছে যায়), তখন ফাংশন দুইটার গুণফল  $f(x) \cdot g(x) = ?$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \times g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+2} \times 4(x+2) = ?$$

আলাদা করে তাকাও;  $x$  অসীমে গেলে  $f(x)$  হবে শূন্য, হৰে অসীমের মতো রাশি চলে আসা মানে বিরা-আ-আ-ট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করার মতো, তাই মান হয়ে যাবে শূন্য।

$x$  অসীমে গেলে  $g(x)$  হবে অসীম; তার মানে শূন্য আৰ অসীমের গুণফলই আৱেকবাৰ আমাদেৱ সামনে!

কিন্তু তুমি দেখো,  $x$ -এর যেকোনো মান  $f(x)$  এবং  $g(x)$  এ বসিয়ে গুণ কৰো, পাৰে ৪।

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+2} \times 4(x+2) = \lim_{x \rightarrow \infty} 4 = 4$$

$x$ -এর মান যত বড়ই হোক, একই মান পাৰে! তার মানে শূন্য আৰ অসীমের গুণফল ৪। এই যুক্তিতেও ভুল নাই!

অসীমের গুণফল ৪। এই যুক্তিতেও ভুল নাই! একইভাবে চিন্তা কৰো। আমি যেভাবে  $g(x)$  ফাংশনটা বানিয়েছি সেখানে ৪-এর জায়গায় ৫ থাকলে লিমিটের মান হতো ৫। বিভিন্ন ফাংশনের জন্য  $x \rightarrow \infty$  তে এদেৱ গুণফল যা খুশি তাই হতে পাৱে!

এ জন্যই  $\infty \times 0$  (অসীম  $\times$  শূন্য) একটা অনিশ্চয় আকাৰ!

### ৫.৩

নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা চলল তাৰপৰ। একপৰ্যায়ে বান্ডি প্ৰশ্ন কৱল অসমতা নিয়ে, **অসমতাৰ সমস্যা** '১ $x^2 - 5x + 6 > 0$ ' এমন অসমতাৰ সমাধান হলো  $x < 2$  বা  $x > 3$

এমন কোনো সংখ্যা কি বাস্তবে আছে— ২-এর ছোট, কিন্তু ৩-এর বড়?

তৃৰ্য বলল, এখানে বা শব্দটা খেয়াল কৰো! বা-এৰ মানে হলো এই দুটো ঘটনা **'বা'** কখন আৰ 'এবং' কখন? একসাথে ঘটবেনা! আলাদা আলাদা ভাবে সত্য হলেই চলবে!  $x$ -এর মান ২-এর থেকে ছোট হলেও চলবে, বা ৩-এর চেয়ে বড় হলেও চলবে! তোমার অসমতাকে এভাবে লেখা যায়—  $(x-2)(x-3) > 0$

দেখো, গুণফল এখানে ধনাত্মক, তাৰ মানে দুটো রাশিই ধনাত্মক বা দুটোই ঋণাত্মক হতে হবে!

$x > 2$  এবং  $x > 3$ 

এমন সব  $x$  যারা একই সাথে  $2$ -এর থেকেও বড় এবং  $3$ -এর চেয়েও বড় তারা হলো সমাধান! এমন কি  $x$  হতে পারে? পারে!  $5, 6, 7$  এমন অসংখ্য সংখ্যা আছে যারা দুটো থেকেই বড়! একটু তাকালেই বুঝবে যারা  $3$ -এর চেয়ে বড়, তারা  $2$ -এর থেকেও বড়! তার মানে  $3$ -এর থেকে বড় হলেই হবে!

এখান থেকে সমাধান পাব  $x > 3$

যদি দুটোই ঋণাত্মক হয়, আমরা পাব  $x-2 < 0$  এবং  $x-3 < 0$   $x < 2$  এবং  $x < 3$ । এমন সব  $x$  যারা একই সাথে  $2$ -এর থেকেও ছোট এবং  $3$ -এর চেয়েও ছোট তারা হলো সমাধান! এমনকি  $x$  হতে পারে? পারে!  $0, 1, -1$  এমন অসংখ্য সংখ্যা আছে যারা দুটো থেকেই ছোট! একটু তাকালেই বুঝবে যারা  $2$ -এর চেয়ে ছোট, তারা  $3$ -এর থেকেও ছোট! তার মানে  $2$ -এর থেকে ছোট হলেই হবে!

এখান থেকে সমাধান পাব  $x < 2$

খেয়াল করো দুইটা আলাদা আলাদা কেস থেকে দুটো আলাদা সমাধান আমরা পাচ্ছি! এ জন্য এদের একসাথে ‘এবং’ দিয়ে লেখা হয় না, লেখা হয় or বা ‘অথবা’ দিয়ে!

এমনিতে এটা মনে রাখার একটা সহজ উপায় আছে।  $(x-a)(x-b)$   
এমন দুটো রাশির গুণফল  $> 0$  হলে সমাধান হয়

‘ছোটটার চেয়েও ছোট অথবা বড়টার চেয়েও বড়’! আর  $< 0$  হলে,  
ছোটটার চেয়ে বড় এবং বড়টার চেয়ে ছোট।

এবারে, ক্লাসের একটা সমস্যা বের করল তবী,  
 $\frac{1}{1+x} > -1$  হলে  $x$ -এর মান কত? ক্লাসের অঙ্ক দেখাতে এখন ভালো লাগছিল না, তবে একটু দেখে তৃর্য বলল, এটা আসলে একটা দারুণ সমস্যা! অনেক কিছু শেখার আছে! সমস্যাটা দেখলেই মনে হয় ব্যস্তকরণ করি, দুপাশ উল্টে

দেখতে সহজ  
ভাবতে অজ্ঞ সমস্যা

দিয়ে অসমতার চিহ্ন বদলে দিই! তারপর সহজেই  $x$ -এর মান পাওয়া যাবে! কিন্তু আসলে সেটা করলেই বিপদ! ফল পাওয়া যাবে আংশিক।  
ব্যাপার হলো, অসমতায় ব্যস্তকরণ করলেই সব সময় চিহ্ন বদলায় না! ধরা যাক,  $3 > 2$ , ব্যস্তকরণ করে চিহ্ন উল্টালে পাব  $1/3 < 1/2$ ; এটাতে সমস্যা নেই।

অসমতায় ব্যস্তকরণ করলে কি সব সময় অসমতার চিহ্ন উল্টে যায়? কিন্তু যদি  $3 > -2$  নিয়ে ভাবি, উল্টালে পাব  $1/3 < -1/2$ . এটা কিন্তু ভুল হয়ে গেল!

আসলে এটা হবে  $1/3 > -1/2$ . অর্থাৎ একপাশে যদি ধনাত্মক রাশি থাকে আর আরেকপাশে ঋণাত্মক, তাহলে যতই ব্যস্ত করি ধনাত্মক রাশি ঋণাত্মকের থেকে বড়ই থেকে যাবে। ফলে দুই পাশে দুই চিহ্ন থাকলে ব্যস্ত করলেও অসমতার চিহ্ন পাল্টাবে না।

এবার মূল সমস্যা

$$1/(1+x) > -1$$

তান পাশে তো দেখাই যাচ্ছে ঋণাত্মক রাশি। আমরা যদি উল্টাতে চাই আমাদের জানতে হবে— বাম পাশেরটা কেমন।

যেহেতু এখানে চলক  $x$  আছে, আমাদের পক্ষে সরাসরি সেটা জানা সম্ভব নয়। তাই দুইটা কেইস আলাদা করে ভাবতে হবে। যখন  $(1+x)$  ধনাত্মক আর যখন  $(1+x)$  ঋণাত্মক।

প্রথমে ধরি  $1+x$  ধনাত্মক, বা  $1+x > 0$ , বা,  $x > -1$

তাহলে মূল অসমতার বামে ধনাত্মক ডানে ঋণাত্মক, দুই পাশে দুই চিহ্নের লোক! এ অবস্থায় ব্যস্ত করলে চিহ্ন পাল্টাবে না! পাওয়া যাবে  $1+x > -1$  বা,  $x > -2$

কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা ধরেই নিয়েছি  $x > -1$

তার মানে  $x$  হবে এমন সব সংখ্যা যারা  $-1$ -এর চেয়েও বড়,  $-2$ -এর চেয়েও বড়! এমন সংখ্যা কারা? খেয়াল করি,  $-1$  আর  $-2$ -এর মধ্যে  $-1$  বড়! যারা বড়টার চেয়েও বড় তারা সবাই অন্যটার থেকে আপনাআপনিই বড় হবে! ফলে, শুধু  $x > -1$  বললেই চলবে। এখান

থেকে সমাধান পেলাম  $x > -1$

এবার ধরি  $1+x$  ঋণাত্মক, বা  $1+x < 0$ , বা,  $x < -1$   
তাহলে বামে-ডানে দুই পাশেই ঋণাত্মক, দুই পাশে একই

চিহ্নের লোক! এ অবস্থায় ব্যস্ত করলে চিহ্ন পাল্টাবে! পাওয়া যাবে  
 $1+x < -1$  বা,  $x < -2$

কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা ধরেই নিয়েছি  $x < -1$

তার মানে  $x$  হবে এমন সব সংখ্যা যারা  $-2$ -এর চেয়েও ছোট,  $-1$ -এর চেয়েও ছোট! এমন সংখ্যা কারা?  $-1$  আর  $-2$ -এর মধ্যে  $-2$  ছোট! যারা ছোটটার চেয়েও ছোট তারা সবাই অন্যটার থেকে আপনা-আপনাই ছোট হবে! ফলে শুধু  $x < -2$  হলেই চলবে! এখান থেকে সমাধান আসবে  
 $x < -2$

তার মানে পূর্ণ সমাধান হবে:  $x < -2$  বা  $x > -1$

তৃষ্ণ এটুকু বলে সবার দিকে তাকায়। সবাই এখনো উজ্জীবিত।

**চোখের ক্ষেত্রফল** ঠিক আছে, আজকে আর না, তোমরা বাসায় যাও।  
যাওয়ার সময় বাঞ্ছের তলাটা দেখতে ভুলো না।

কেউই ভুলত না। প্রতিদিন ফেরার সময় একটা করে সমস্যা নিয়ে  
যাওয়াটা ওদের একরকম রেওয়াজ হয়ে গেছে। ভাইয়া উত্তরও বলে  
দেয় না, শুধু বলে উত্তর হলে তুমি নিজেই অনুভব করতে পারবে!

বাসায় এসে কাগজ খুলে তবী দেখে  
একটা ছবি আঁকা, যেটা দেখতে একটা  
চোখের মতো। চোখের সাদা অংশের | ← ৯  
ক্ষেত্রফল বের করতে হবে!

**বৃত্ত ছিল চোখের মণি— সীমানা বৃত্তচাপ**  
ছবিতে তাকাও, জানতে পারবে কার কোন পরিমাপ

চিন্তা করবে ধী-রে বৎস, পিথাগোরাসের মতো—  
বলো তো, চোখের সাদা অংশের ক্ষেত্রফলটা কত?

এটা বেশ কঠিন সমস্যা, তবে ওরা সমাধান করতে পারলে মজা  
পাবে!

## অধ্যায় ৬

### জ্যামিতির জমজমাট জল্লনা

#### ৬.১

এ শহরে যে অল্লকটা বহুতল ভবন আছে, তারই একটার পাশ দিয়ে  
হাঁটছিল তৃষ্ণ। এটার মালিক ছিলেন বিরাট ধনাত্মক এক ব্যবসায়ী।  
লোকটা মারা গেছেন এক মাস আগে। তৃষ্ণ ভাবছে এই লোকটা  
পৃথিবীতে আসলে কী রেখে গেলেন! কোনো নতুন পরমাণু তিনি তৈরি  
করেননি, ধ্বংসও করেননি, যা ছিল তা-ই আছে। তৃষ্ণের মনে হয়,  
আমরা যা রেখে যেতে পারি সেটা হলো আইডিয়া, চিন্তা। ভাবনাগুলোই  
আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ!

তৃষ্ণ ডুবে যায় ভাবালুতায়— ওর চোখ দুটো যেন সামনের মানুষগুলোকে  
দেখতে পায় না আর। ও দেখে ভবিষ্যৎ। ও মোহগ্রস্ত মানুষের মতো  
হাঁটতে হাঁটতে ভাবে— একদিন এই ইট-কাঠের পৃথিবী থেকেও আরও  
বড় একটা অস্তিত্ব থাকবে মানুষের। একটা ভার্চুয়াল জগতে সবাই  
ঘুরে বেড়াবে। ইন্টারনেটের মধ্য দিয়ে মানুষ সত্যি সত্যি তুকে যাবে  
একটা কাল্পনিক সভার ভেতরে। সেখানে শিল্পী-স্থপতিরা ইমারত  
বানাবে, সে ইমারত বানানোর জন্য বাস্তব পৃথিবীর কোনো বাধাই আর  
বাধা রইবে না। সেখানে আইনকানুন থাকবে। সেই পৃথিবীতে মানুষ  
জমির মতো বিক্রি করবে কো-অর্ডিনেট। পৃথিবীজুড়ে কোটি কোটি  
কম্পিউটার, ডাটা সেন্টার সেই জগৎটা বাঁচিয়ে রাখবে। সব সম্ভব হবে  
গণিতের শক্তিতে!

আজকে নজিবুল্লাহ স্যার বান্টিকে আবার অপমান করেছেন। বান্টি খেপে গিয়ে ওকে বলেছেন স্যার, ‘এটা কি তোর বাবার লেখা যে যা ইচ্ছা তা-ই বলবি?’ এরপর অনেকক্ষণ ধরে তোতাপাখির মতো হওয়ার ইচ্ছেটা আবার তীব্র হয় তৃর্বের। সম্প্রতি বিতর্ক ক্লাবে নাম লিখিয়েছে, তা ছাড়া সারা দেশে অলিম্পিয়াডের সময় নজিবুল্লাহ স্যারদের মতো মানুষদের কাছে প্রায়ই ঘেতে হয়। ‘ওনার সাথে কথা বলতে ভয় পাওয়ার কিছুই নাই আমার,’ তৃর্য ভাবে।

### ৬.৩

তৃর্য আজকে জ্যামিতি পড়াবে ভেবেছিল। আগের দিনই বান্টিরা জানিয়েছিল যে ওদের অনুশীলনীর এক্সট্রাগ্লোতে সমস্যা আছে, দেখিয়ে দিতে হবে। আলোচনার শুরুতে তৃর্য বলল জ্যামিতির শুরুর কথা। জ্যামিতির শুরু কি আজকের কথা! খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অন্দে প্রাচীন মিসরের মানুষ যে জ্যামিতি ব্যবহার করত তার নিদর্শন মেলে। জ্যামিতির জ্ঞান না থাকলে অত বড় পিরামিড বানানো ওদের পক্ষে সম্ভব হতো না।

#### জ্যামিতির শুরু কোথায়?

বাংলায় যে আমরা বলি ‘জ্যা’ মানে ভূমি আর ‘মিতি’ মানে পরিমাপ— এই ভূমি পরিমাপের কাজেরও নিদর্শন পাওয়া যায় মিসরে— নীল নদের অববাহিকায় গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতায়। মিসরের উত্তরে ছিল ভূমধ্যসাগর, সেটা পাড়ি দিয়ে যাওয়া যেত গ্রিসে। তাদের ভেতর ছিল বাণিজ্যিক যোগাযোগ। বাণিজ্যের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদানপ্রদানও ঘটত নিয়মিত। মিসরীয়দের পরে জ্যামিতির বিকাশে গ্রিকদের ভূমিকা অনেক। মহান দার্শনিক প্লেটো একটা দর্শনের বিদ্যালয় খুলেছিলেন, নাম ছিল ‘একাডেমি’। সেখানে দরজায় বড় করে লেখা ছিল, ‘যে লোক জ্যামিতি জানে না, সে যেন এই দরজা দিয়ে না ঢোকে!’

বান্টি বলল, ব্যাপক তো! অনেকটা অ্যাডমিশন টেস্টের মতো মনে হচ্ছে।

আসলেই তা-ই। বোঝো, তারা জ্যামিতিকে কী সম্মান করত! অবশ্য প্লেটোও দেড় শ বছর আগে গ্রিসের সামোস দ্বীপে জন্মেছিলেন মহান পিথাগোরাস। তার উপপাদ্য তোমরা এখন পড়ো। পিথাগোরাস লোকটা বেশ রহস্যময় ছিলেন। ওনাকে নিয়ে নানা গল্প প্রচলিত আছে, তবে জ্যামিতিতে তার আসলেই বড় কোনো অবদান আছে কি না, এটা নিয়ে অনেকের সন্দেহ আছে!

#### বলেন কী?

তবু ইতিহাস তাকে অনেক সম্মান করে, তাকে বলা হয় প্রথম প্রকৃত গণিতবিদ।<sup>২</sup> তবে যদি প্রাচীন গণিত নিয়ে বলতি হয় দুটো নাম অবধারিতভাবে চলে আসবে— প্রথমত ‘ইউক্লিড’ যার লেখা তেরো খণ্ডের এলিমেন্টস বইটিকে বলে গণিতের ধর্মগ্রন্থ। উনি যখন বইটা লেখেন সেই সময়ে জ্যামিতি আর সংখ্যাতত্ত্বের যত জ্ঞান ছিল, সব তিনি একসাথে সংকলন করেন। তাকে বলা হয় ‘জ্যামিতির জনক’।

#### আর আরেকজন?

আরেকজন হলেন আর্কিমিডিস, তাকে বলা হয় মানব ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি গণিতবিদের একজন।

#### বাকি দুজন কারা?

কার্ল ফ্রেড্রিখ গাউস আর আইজ্যাক নিউটন। যাহোক ইউক্লিডের কথায় ফিরি। তোমরা তোমাদের ক্লাসে যত জ্যামিতির উপপাদ্য শেখে সবই তার এলিমেন্টস বইটা থেকে নেওয়া।

তৃর্য একটু উদাস হয়ে বলল, কী অসাধারণ ব্যাপার চিন্তা করতে পারো? আড়াই হাজার বছর আগে লেখা একটা বই এখনো মানুষ ব্যবহার করছে। এটা গণিতের একটা দারুণ ব্যাপার। একবার যে উপপাদ

<sup>২</sup> লেখক পিথাগোরাসের মহাভক্ত, তার জীবন আর উপপাদ্য নিয়ে কিছু মজার তথ্য পাওয়া যাবে এই লেখকের লেখা আরেকটি বই ‘গণিতের রঙে: হাসিখুশি গণিত’ এ।

সত্য প্রমাণিত হবে, তা যুগের পর যুগ সত্য থাকবে; মহাবিশ্বের যেই  
প্রান্তেই যাও সব জায়গায় সত্য থাকবে।<sup>৩</sup>

এটা বলে তৃৰ্য ওদের বইটা নিয়ে বলল, দেখো, ইউক্লিড কী সুন্দর করে  
সাজিয়েছেন গণিতের সমস্ত জ্ঞানকে। প্রথমে বিন্দু, রেখা এসবের সংজ্ঞা  
নিয়েছেন, যাদের বলেছেন স্থিকার্য আৱ স্বতৎসিদ্ধান্ত (Axioms and  
Postulate)। এরপর সেগুলো সত্য ধৰে প্ৰমাণ কৰেছেন নানান সব  
উপপাদ্য, কত গোছানো কাজ!

এবাবে পৃথীৱী হঠাৎ প্ৰশ্ন কৰল, ভাইয়া, গণিতের বিন্দুৰ সংজ্ঞা হিসেবে  
আমৰা শিখেছি, যাৱ দৈৰ্ঘ্য নেই, প্ৰস্থ নেই, উচ্চতা ও নেই, শুধু অবস্থান  
আছে তাকে বিন্দু বলা হয়।

এটা আবাৰ কী রকম? দৈৰ্ঘ্য, প্ৰস্থ, উচ্চতা ছাড়া তো অবস্থান হয় কী  
কৰে?

**বিন্দু কী জিনিস?** তৃৰ্য বলল, তুমি ঠিক আছ, খেয়াল কৰো, বিন্দুৰ  
ওই সংজ্ঞাটা ইউক্লিড দিয়েছিলেন এখন থেকে  
আড়াই হাজাৰ বছৰ আগে। এটা আৱ গ্ৰহণযোগ্য  
নয় বৰ্তমান গণিতে। এখন আৱ এটাকে অন্যকিছু দিয়ে সংজ্ঞা দেওয়া  
হয় না; বৰং একটা প্ৰাথমিক ধাৰণা বা **Primitive Notion** হিসেবে ধৰা  
হয়, যাকে আগেৰ কোনো কিছু দিয়ে সংজ্ঞা দেওয়া যাবে না। বিন্দু হলো  
স্পেস বা 'স্থান' নামক সেটেৱ একটি উপাদান।

**মোটা মাৰ্কাৰ, ০.৫ মিমি কলম  
নাকি সূক্ষ্ম পেনসিলে আঁকা বিন্দু?** ভাইয়া, বিন্দু তো কেবল একটা  
অবস্থান নিৰ্দেশ কৰে। কিন্তু আমাৰ  
প্ৰশ্নটা হচ্ছে যে এটাৱ কি এমন  
কোনো পৰিমাপ আছে যাৱ ভিত্তিতে আমৰা একটা অবস্থান কে বিন্দু  
বলব। মনে কৱেন, আমি বিন্দু আঁকতে চাই। বল পয়েন্টেৱ বিন্দু  
বলব।

<sup>৩</sup> এটা সত্য থাকবে যদি একই 'এক্সিওমেটিক সিস্টেম' হয়। সমতলে পিথাগোৰাসেৰ  
উপপাদ্য সবসময় খাটবে। আধুনিক জ্যামিতিতে উপবৃত্তীয়, অধিবৃত্তীয় তল আছে।  
সেখানে সৱাসৱি এটা সত্য নাও হতে পাৱে।

থেকে মাৰ্কাৰ পেনেৱ বিন্দু অনেক বড়। এৱেপৰও মাৰ্কাৰ পেনে আঁকা  
বিন্দুকেও কিন্তু বিন্দুই বলছি। আকাৰ আকৃতি চিন্তা কৰলে সেই মাৰ্কাৰ  
পেনেৱ বিন্দুতে অনেকগুলো বল পয়েন্টেৱ বিন্দু পাৱয়া যাবে। তাহলে  
কত ছোট হলে বিন্দু বলতে পাৱব?

তোমাৰ চিন্তাটা খুবই যুক্তিযুক্ত। তবে আমাৰ  
উভয়টা মনে হয় তোমাদেৱ ভালো লাগবে না।  
সত্য হলো জ্যামিতিৰ কোনো চিৰ কোনো দিন **বিন্দু, রেখা, বৃত্ত** কি  
আঁকা যায় না। একটা বৃত্ত আঁকা যায় না, রেখা **আসলে আঁকা যায়?**  
যায় না, বিন্দু আঁকা যায় না। আমৰা যেগুলো  
আঁকি, এগুলো প্ৰতীকমাত্ৰ, তবে প্ৰতীকগুলো  
এমনি এমনি না।

আসল কৃপটা কেমন তাৰ একটা মোটাদাগেৱ অনুমান এই ছবিগুলো।  
একটা বৃত্তেৱ কথা ভাবো। কেন্দ্ৰ থেকে পৰিধিৰ সবগুলো বিন্দুৰ দূৰত্ব  
সমান হওয়াৰ কথা। কিন্তু তুমি যখন  
আঁকছ, পৰিধিৰ দাগটাৰ তো কিছু **ছবি 'আঁকি' না ছবি 'লিখি'?**  
হলেও প্ৰস্থ থাকবে। যত মোটা কালিতে  
আঁকবে, প্ৰস্থ তত বেশি। তাহলে ভাবো কেন্দ্ৰ থেকে এই দাগেৱ বাইৱেৰ  
বিন্দুটাৰ দূৰত্ব আৱ কেন্দ্ৰ থেকে এই দাগেৱ ভেতৱেৰ বিন্দুৰ দূৰত্ব কি  
একই হবে? হবে না। কালি যত সূক্ষ্ম হবে, তত নিৰ্খুত হবে ছবি।

তবে চিন্তা কৱা যায় আসল যে বৃত্ত সেটা দেখতে এমন গোলজাতীয়ই  
হবে। ফলে আমাদেৱ চিন্তাৰ সাহায্যকাৰী হিসেবে এই ছবিগুলোৰ দাম  
আছে।

তাহলে ভাইয়া, এত উপপাদ্য, সম্পাদ্য সব অনুমানেৱ ওপৰ নিৰ্ভৰশীল?  
না, না, গণিতেৱ কিছুই শুধু অনুমানেৱ ওপৰ নিৰ্ভৰশীল নয়! আধুনিক  
জ্যামিতিতে ছবি কোনো ব্যাপারই না! একেকটা জ্যামিতিক চিৰ হলো  
একেকটা সেট, সেই সেটেৱ উপাদান হলো বিন্দু। আধুনিক উপায়ে  
হয়তো ৫ একক ব্যাসাৰ্ধেৱ একটা বৃত্ত আঁকা হবে এভাৱে—

$$\{x, y \in R: x^2 + y^2 = 5^2\}$$

হ্যাঁ, ভাইয়া

' $x$  আর  $y$ -এর কোন কোন মান নিলে ওপরের সমীকরণটা ঠিক থাকে, অমন এক শটা বিন্দু খুঁজে বের করো। যেমন একটা হতে পারে  $x=3$ ,  $y=4$ । আরেকটা হতে পারে  $x=0$ ,  $y=5$ -এ রকম। এদের সবাইকে ছক্কাগজি বসালে একটা নিখুঁত বৃত্ত পাওয়া যাবে। দেখেছ, আমরা হলো না; বরং লেখা হলো।

প্রশ্ন আর চিন্তা ব্যাপারটা খুব অভূত। কী থেকে যে কী মনে পড়ে! ছক্কাগজি লেখচিত্রি আঁকার কথা শুনে বান্ডির মনে প্রশ্ন জাগল, আছা ভাইয়া,  $x$  অঙ্ককেই কেন স্বাধীন ধরা হয়? আমাদের শিখিয়েছে  $x$  হলো স্বাধীন চলক আর  $y$  হলো অধীন। উল্টোটা হলে সমস্যা কী ছিল?

তৃৰ্য বলল,  $x$  অঙ্ককেই স্বাধীন ধরতে হবে, এটা কোনো বাধ্যতামূলক ব্যাপার না। তুমি চাইলে  $x$  অঙ্ককে ওপর থেকে নিচে কিংবা কোনাকুনি করেও বসাতে পারো, সে ক্ষেত্রে  $y$  অঙ্ককে তার সাথে সমকোণে রাখলেই চলবে।

### **X অঙ্ককেই কেন স্বাধীন ধরা হয়?**

গণিতে বা বিজ্ঞানে যখন এমন কিছু সামনে চলে আসে, যেটাকে অনেকভাবে দেখা বা লেখা সম্ভব, তখন সবাই চেষ্টা করে কোনো একটাকে নির্দিষ্ট করতে, যেন সবাই সহজে বুঝতে পারে। এ ব্যাপারটাকে বলে 'রীতি' বা 'কনভেনশন'। ধরো, এই যে '+'-এটাকে আমরা এখন বলি প্লাস চিহ্ন। আজ থেকে মাত্র কয়েক শ বছর আগেও কিন্তু এই চিহ্ন ছিল না। ইউরোপে সবাই P দিয়ে প্লাস বোঝাত। ভারতীয় উপমহাদেশে ছিল অন্য প্রতীক। এখন সবাই '+' এটাকে প্লাস চিহ্ন হিসেবে জানে। এটাও একটা রীতি। P দিয়ে লিখলে গণিতের হিসাবে কোনো ভুল হতো না।

আবার  $x$  অঙ্কের প্রসঙ্গে যাই। এখন আমরা চিন্তা করতে পারি, কেন এটাকেই সবাই রীতি হিসেবে ধরল। সেটার জন্য সম্ভবত আমাদের

সভ্যতার বিকাশ নিয়ে ভাবতে হবে। চাইনিজ, জাপানিজ ভাষার মতো কিছু ভাষা বাদে অধিকাংশ ভাষাতেই অনুভূমিকভাবে অঙ্করঙ্গলো লেখা হতো এবং আরবি, ফারসি, হিন্দু এমন কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ ভাষা বাম থেকে ডানে লেখা হয়। এমনকি তারও আগে, অধিকাংশ সভ্যতাতে যখন ছবি আঁকা হতো, বাম থেকে ধীরে ধীরে ডানে যাওয়াটা সময়ের সাথে এগিয়ে যাওয়া চিন্তা করা হতো।

পরিবর্তন চিন্তা করলে এখনো মাথায় প্রথম আসে সময়ের সাথে কোন জিনিস কীভাবে বদলাচ্ছে। সময়কে অনুভূমিক অঙ্কে রেখে পরিবর্তন চিন্তা করাটায় আমাদের একধরনের অভ্যন্তর চলে এসেছে। আমার ধারণা এ কারণে অনুভূমিক অঙ্কে স্বাধীন চলক রাখার ব্যাপারটা সবাই সহজে মেনে নিয়েছে।

এবার টিনা জিজেস করল, ভাইয়া, একটু আগে উপপাদ্যের কথা বলছিলেন, তখন মনে হলো, এই যে পিথাগোরাসের সূত্র মানে,  $\text{অতিভুজ}^2 = \text{ভূমি}^2 + \text{লম্ব}^2$

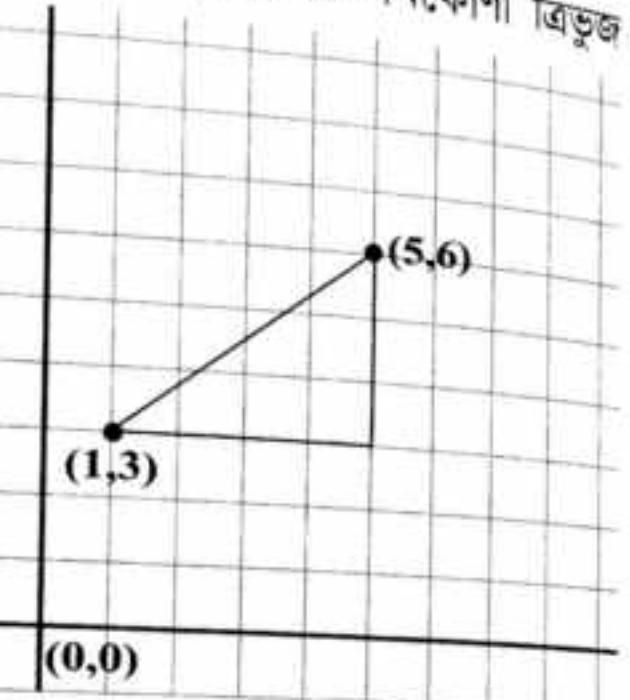
এই সূত্র বর্তমান বাস্তবজীবনে আমাদের কী কাজে লাগে? আর তৎকালীন সময়ে এই সূত্রের কাজ কী ছিল?

তৃৰ্য বলল, দেখো, এটা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে কাজের সূত্রগুলোর একটা। সেই কালে ক্ষেত্রফল মাপা, সমকোণ তৈরিতে এটা ব্যবহার হতো। ধরা যাক একটা জমি আছে, যেটা দেখতে আঁকাবাঁকা ৯ ভুজের মতো। তার ক্ষেত্রফল কীভাবে মাপব? এটাকে ৭টা ত্রিভুজে ভাগ করে নেওয়া হবে, এরপর ত্রিভুজগুলোর বাহুর দৈর্ঘ্য জানলেই হেরনের সূত্র দিয়ে সব কটার ক্ষেত্রফল জানা যাবে। তিন বাহু জানলে ক্ষেত্রফল বের করার পরিসীমা, বা তিন বাহুর যোগফলের অর্ধেক। এই সূত্রটা বের করতে গেলেও লাগবে পিথাগোরাস।

**পিথাগোরাসের উপপাদ্য  
কী কাজে লাগে?**

**নয় ভুজের ক্ষেত্রফল  
কীভাবে বের করা যাবে?**

**স্থানাংকের দূরত্ব** এই উপপাদ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হলো স্থানাংক জ্যামিতিতে। ধরো একটা বিন্দুর ভূজ কোটি (১,৩), আরেকটার (৫,৬)। তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত আমরা জানতে চাই। ছবিতে দেখো, তাদের দিয়ে সহজেই একটা সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি করা যায়। তার ভূমি  $(5-1)=4$  একক, আর লম্ব  $(6-3)=3$  একক। পিথাগোরাস থেকে সহজেই পাওয়া যায় অতিভূজ =  $\sqrt{(4^2+3^2)}=5$ । এটাই তাদের ভেতর দূরত্ব। সাধারণ সূত্র দিয়ে বললে এভাবে বলা যায়, দুটো বিন্দুর ভেতর দূরত্ব =  $\sqrt{(\text{ভূজদ্বয়ের অন্তর}^2 + \text{কোটিদ্বয়ের অন্তর}^2)}$ ।



আসলে, বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই, যেখানে এটা ব্যবহার হয় না। পিথাগোরাসের সূত্রের একটা ত্রিকোণমিতিক রূপ আছে, যেটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো  $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ , এটা ছাড়া কোনো প্রকৌশল চলে না।

**পিথাগোরাস দিয়ে আইনস্টাইনের সূত্র** আর যদি আধুনিক বিজ্ঞানের কথা বলো— পিথাগোরাসের সূত্র ব্যবহার করে এমনকি আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার সময় সম্প্রসারণও প্রমাণ করে ফেলা যায় মাত্র কয়েক লাইনে! এটা দিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন, আইনস্টাইন বলেছিলেন চলত ঘড়ি ধীরে চলে। দাঁড়াও, তোমাদের এটা শিখিয়ে দিই। বলে সে খাতায় একটা ছবি আঁকল। মনে করো,

একটা ট্রেন, দুইটা লোক। একজন ভেতরে অন্যজন বাইরে। দুজনই সময়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব করতে পারে। জেনে রাখো—  
 $\text{দূরত্ব} = \text{বেগ} \times \text{সময়}$ ।

ভেতরের লোক একটা টর্চ জ্বালল। সে দেখল আলো। সময় পরে সোজা মেঝেতে পৌছাল। আলোর বেগকে  $c$  দিয়ে লেখা হয়। তাহলে আলোর দূরত্ব হবে ‘বেগ গুণ সময়’ টর্চ থেকে মেঝের দূরত্ব হবে ‘বেগ গুণ সময়’ মানে  $ct$ ।

বাইরের লোকটা দেখছিল ট্রেনটা  $v$  বেগে গতিশীল। সে দেখল টর্চের আলো  $t'$  সময় পরে  $ct'$  দূরত্ব অতিক্রম করে মেঝেতে পৌছাল। এই সময়ে ট্রেনটা  $vt'$  দূরত্ব অতিক্রম করল। এখন পিথাগোরাসের সূত্র থেকে পাব—

$$(ct')^2 = (ct)^2 + (vt')^2 \text{ বা, } c^2 t'^2 = c^2 t^2 + v^2 t'^2$$

$$t'^2 = t^2 + \frac{v^2}{c^2} t^2$$

$$t'^2 - \frac{v^2}{c^2} t^2 = t^2$$

$$t'^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = t^2$$

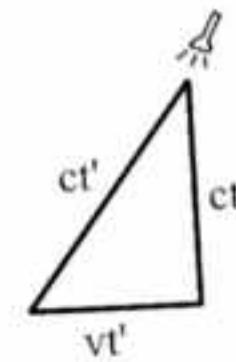
$$t'^2 = \frac{t^2}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)} \text{ বা, } t' = \frac{t}{\sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}}$$

এটা দেখতে তেমন কঠিন কিছু না। কিন্তু এর ফলাফল ভয়াবহ। মনে কর, ট্রেনের জায়গায় আছে একটা মহাকাশযান যেটা দুরত্ব গতিতে চলতে পারে। আলোর গতির শতকরা ৮০ ভাগ গতিতে। তাহলে  $v/c=0.8$ । এখন ধরো, তোমার এক যমজ ভাই তোমাকে পৃথিবীতে রেখে ওই মহাকাশযানে করে মহাশূন্যে ঘূরতে গেল, আবার একই বেগে ফিরেও এল। সে মহাকাশযানের ভেতরে হিসাব করে দেখল ৬ বছর কাটিয়েছে। তুমি পৃথিবী থেকে সময়টা কেমন দেখবে? ওই সূত্রে বসালে পাব

$$t' = \frac{t}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{t}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = 10 \text{ বছর।}$$

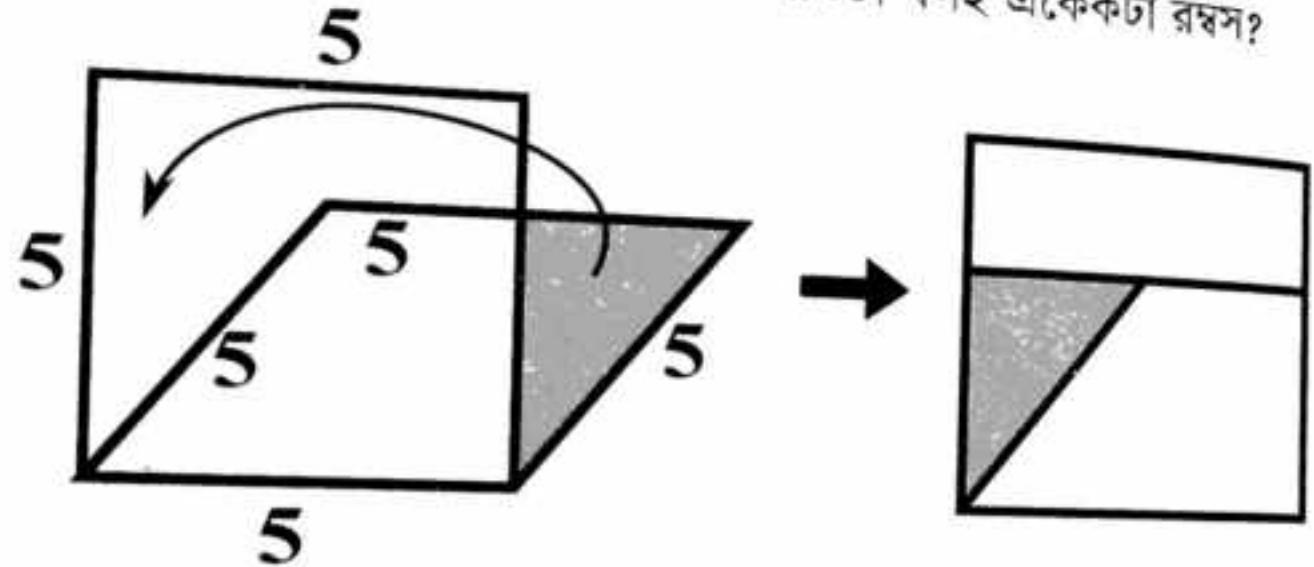
অর্থাৎ তার যখন বয়স বাঢ়বে ১০, তোমার বাঢ়বে ১০। কী অভুত কথা, তাই না?

এবার শুধু পৃথীবী নয়, বাকিরাও হা হয়ে গেল। এও কী সন্দেহ?



ଆୟତ, ବର୍ଗ, ରହସ୍ୟ : ମିଳ-ଅମିଳ      ବେଶ କିଛିକଣ ଶାନ୍ତ ଥାକଲ ସବାଇ ।  
ଏରପର ପୃଷ୍ଠୀ ଏକଟା ହେଲେମାନୁସି ପ୍ରଶ୍ନ  
କରଲ ତବୁ କେଉ ଓକେ ଆଟକାଳ ନା । ଓରା ଜାନେ ଚାଇଲେ ସବ ପ୍ରଶ୍ନ ଥେକେଇ  
ଶେଖା ଯାଯା । ଭାଇଯା, ବର୍ଗକେ କି ଆୟତ ବଲା ଯାବେ ? ଆୟତର ସବ ଶତ  
ବର୍ଗେର ମଧ୍ୟ ରଯୋଛେ ।

হ্যাঁ, প্রতিটা বগই আয়ত! যে আয়তৰ সমিহিত বাহু সমান সেটাই বগ! তাহলে বর্গের কর্ণদ্বয় পরস্পর কেন সমকোণে সমবিখ্যিত করে না? কে বলল করে না! করে তো! কারণ প্রতিটা বগই একেকটা রম্ভস?



ভাইয়া, আমি বুঝি না— ৫ সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গের ক্ষেত্রফল এবং  
একই মাপের অর্থাৎ ৫ সেমি বাহুবিশিষ্ট রম্বসের ক্ষেত্রফল একই হয়  
না কেন? একইভাবে সামান্তরিক এবং আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ও কেন  
একই হয় না?

তৃষ্ণ একটা ছবি এঁকে বোঝাল ব্যাপারটা। উচ্চতা বিষয়টা এখানে  
জরুরি। বাহু সমান রাখতে গিয়ে রম্ভসের উচ্চতা যায় কমে। ফলে  
ক্ষেত্রফল কমে যায়। দেখো, ছবিতে একই ভূমির ওপরে একটা বর্গ  
আরেকটা রম্ভস এঁকেছি। রম্ভসের গাঢ় করা অংশটা কেটে সামনে  
বসিয়ে দিলে পাওয়া যাবে একটা আয়তক্ষেত্র। দেখতেই পাছ সেটা  
মূল বর্গ থেকে ছোট!

মূল বগ থেকে হোচ :  
ভাইয়া, এবার পাই নিয়ে কিছু বলেন। পাই-এর মান বের করার আসল  
ফর্মুলাটা কী?  $22 \div 7$  দিলে যেটা আসে, ওইটা পৌনঃপুনিক হয়ে  
যায়... ।

তৃষ্ণ বলল,  $\frac{22}{7}$  পাই-এর একটা  
 অনুমানমাত্র। আসল ফর্মুলা হলো,  $\frac{22}{7}$ -এর আনন্দটা কী রকম?  
 পাই = পরিধি/ব্যাস  $\pi$ । তবে মান  
 বের করার জন্য অনেক অসীম ধারা আছে। সেগুলোর ভেতর সবচেয়ে  
 সহজ আর সবচেয়ে কম কাজের ধারা হলো—  

$$\pi = 4 \left( 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \right)$$

এটা দেখতে সহজ হলেও বেশি কাজের না, ৭  
 অনেকগুলো পদ নিলে তবে গিয়ে অল্প কয়েক ঘৰ  
 মান ঠিকঠাক পাওয়া যায়। আরও অনেক ধারা  
 আছে, যেগুলো খুব কাজের। আরেকটা কথা—  
 $22 \div 7$ -কে অনেকেই বলে ‘পাই’। আসলে এটা  
 পাই না, পাই-এর খুব কাছাকাছি একটা মান!  
 ৮ এর পৌনঃপুনিক চক্র  
 ৯ এর মান দর্শাইকর পর অনেক

পাই না, পাই-এর খুব কাছাকাছি অঁ...  
 ২২÷৭ নিজেও কিন্তু কম আনন্দময় নয়। এর মান দশমিকের পর অনেক  
 দূর বের করে দেখো— ৩.১৪২৮৫৭ ১৪২৮৫৭ ১৪২৮৫৭ ১৪২৮৫৭  
 ১৪২৮৫৭... বাহ, ১৪২৮৫৭ এই অংশটুকু বারবার ফিরে আসছে—  
 পৌনঃপুনিক।

পৌনঃপুনিক ।  
 এবার  $23 \div 7$ -এর মান দেখি  $3.285718\ 285718\ 285718$   
 $285718\dots$  এবার কেমন একটা খটকা হলো মনে ।  $28 \div 7$ -এর মান  
 $3.828571\ 828571\ 828571\dots$  কী যেন একটা হচ্ছে,  
 দেখি  $3.828571\ 828571\ 828571\dots$  কী যেন একটা হচ্ছে—আবার দেখি  $25 \div 7 = 3.571428\ 571428$   
 $571428\ 571428\dots$  ।

আসলে সবাই ঘুরে ফিরে '১৪২৮৫৭' এই সংখ্যাগুলোর মাঝেই রয়ে  
গেছে। পৃথিবীর যেকোনো পূর্ণসংখ্যাকে ৭ দিয়ে ভাগ দিলে দশমিকের  
পর হয় শূন্য থাকবে (যদি নিঃশেষে বিভাজ্য হয়), আর নয়তো  
'১৪২৮৫৭'-এর মাঝেই আটকা পড়তে হবে। এখানে একটা চক্র আছে!  
দশমিকের পর একঘর দেখলেই বাকি অনন্তঘর বলে দেওয়া যায়।  
যেমন  $88 \div 7 = 6.8\dots$  দশমিকের পর পেলাম ৮। তাহলে বাকিটুকু  
আর ভাগ করার দরকার নেই— চক্র দেখেই বলে দিতে পারি, এটা হবে  
 $6.857142857142\dots$  তাহলে  $19 \div 7$  কত হবে?

যাহোক, আমি যখন ঠিক তোমাদের বয়সী, তখন এই চক্রটা বের করেছিলাম। একটা হাস্যকর নাম দিয়েছিলাম, ভাগীয় চক্র, যদিও অভিধানে ভাগীয় বলে কোনো শব্দ নেই। পরে জেনেছি, এটাকে বলে পৌনঃপুনিক চক্র। নম্বর থিওরি বা সংখ্যাতত্ত্বে এটা নিয়ে বড় বড় গবেষণা আছে। আমি একা একা চিন্তা করে ওইটুকু বের করে ফেলেছি, সেটার মধ্যেও একটা আবিন্ধার আবিন্ধার ব্যাপার আছে, তাই না? এমন চক্র কি শুধু ৭-এর জন্যই আছে?

নাহ, যদি ভাগফলের দশমিকটা একটু পরেই শেষ হয়— যেমন ২.৩২, তখন তাদের আমরা বলি সঙ্গীম দশমিক। কোনো সংখ্যাকে যদি ২ দিয়ে ভাগ দাও সঙ্গীম দশমিক পাবে। ৪ দিয়ে ভাগ দিলে সঙ্গীম পাবে, ৫ দিয়ে ভাগ দিলে সঙ্গীম পাবে, ৮ দিয়ে, ১০ দিয়ে, ১৬ দিয়ে, ২০ দিয়ে, ২৫ দিয়ে ভাগ দিলে সঙ্গীম পাবে। এরা আসলে কারা? যাদের ভেতর মৌলিক সংখ্যা আছে শুধু ২ আর ৫ আছে! ১০ এর ভেতরে তাকাও, সেখানে আছে ২ আর ৫। ২৫ এর ভেতরে আছে শুধু দুইটা ৫। এমন করে ৫০ এ আছে দুইটা ৫ আর একটা ২। দিয়ে ভাগ দিলেও সেটা সঙ্গীম ভাগফল দেবে। এরা কেন সঙ্গীম দেবে সেটা আমি বলব না, তবে তোমাদের ভাবার জন্য একটা ছোট লাইন বলতে পারি—

$$\frac{1}{16} = \frac{1}{2 \times 2 \times 2 \times 2} = \frac{1 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5}{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5} = \frac{625}{10000}$$

পৃথী বলল, ও বুঝেছি, আসলে নিচে ১০ বা ১০-এর পাওয়ার বানানোটাই আসল। ২ কিংবা ৫ থাকলে সেটা সব সময় সম্ভব। অন্য সময় সম্ভব না।

বান্তি মনে করিয়ে দিল, ভাইয়া, আমি তো জানতে চাইলাম কখন পৌনঃপুনিক আসবে?

আমি তো সেটাই বললাম, পৃথীও সেটাই বলল। যেসব ভাজক থেকে সঙ্গীম দশমিক আসবে না, তারা ছাড়া আর সবাই পৌনঃপুনিক মান দেবে। নিঃশেষে বিভাজ্য হলে অবশ্য দশমিকের পর কিছুই থাকবে না। মানে হলো— এসব ক্ষেত্রে দশমিকের পর হয় কিছুই থাকবে না, নয় অনন্তকাল চলবে। যেমন ৬ থেকে ৩ দিয়ে ভাগ দিলে পাবে ২, দশমিকের

পর কিছু নাই। ৭-কে ৩ দিয়ে ভাগ দিলে পাবে ২.৩৩৩৩৩৩... এমন অনন্তকাল ও আসবে। ৩ এর চক্র দুইটা। হয় ৩৩৩ আসবে, নয় ৬৬৬৬৬।

যেমন ১৭-এর চক্র একটা সেখানে আছে ১৬টা অঙ্ক। ১৭ দিয়ে ভাগের জন্য চক্রটা হলো— ০৫৫৮৮২৩৫২৯৪১১৭৬৪৭ ০৫৫৮৮২৩৫২৯৪১১৭৬৪৭ ০৫৫৮৮২৩৫২৯৪১১৭৬৪৭ এগুলোই ০৫৫৮৮২৩৫২৯৪১১৭৬৪৭ ০৫৫৮৮২৩৫২৯৪১১৭৬৪৭ এর জন্য আবার দুইটা চক্র লাগে।

বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। ১৩-এর জন্য আবার দুইটা চক্র লাগে। কেন বলে তৃষ্ণ ওদের দিকে তাকায়, ও বোবে ওদের মনে প্রশ্ন— এমন কেন হয়। তৃষ্ণ ভাবে— এমন সব প্রশ্ন যাদের মাথায় উকি দিচ্ছে, গণিতের আরেকটু দেখার ইচ্ছে, এটা থেকেই তো সব জ্ঞানের শুরু।

আলোচনা যে পাই নিয়ে ছিল সেটা অনেকেই ভুলে গিয়েছিল। তবু মনে করি দিল, ভাইয়া পাইয়ের মান নিয়ে আরও একটা প্রশ্ন আছে আমার পাই তুলে পাইয়ের মান অতঘর জেনে লাভ কী?  $\pi=3.1415926535897932384626433\ldots$  এভাবে তো আজীবন চলতেই থাকবে। কিন্তু এত ঘর কি আসলে কাজে লাগে কখনো?

তৃষ্ণ বলল, সত্যি কথা বলতে এত ঘর ব্যবহারের তেমন কোনো ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই! যদি মাপামাপির কথা ভাবি, বলা হয়, পরমাণুর গভীরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবের জন্য দশমিকের পর ৩৯ ঘর নিলেই চলে! মহাকাশের হিসাব-নিকাশও যত সূক্ষ্ম হয় তত ভালো। তবে গণিতে ব্যবহার হওয়াটাই মূল কথা না! সৌন্দর্যও জরুরি!

আরেকটা ব্যবহার বলতে পারি! দশমিকের পরে পাই-এর যে মান সেটা একটা র্যাডম নম্বর, যন কোনটা হবে তা কোনো নিয়ম মানে না, আগের এক শটা দেখলেও ধারণা করা যায় না পরের একটা অঙ্ক কত হবে! এমন সংখ্যা পাওয়া খুব সহজ কথা না! পরিসংখ্যানে এমন র্যাডম নম্বর দিয়ে অনেক হিসাব করা হয়! তখন পাই-এর মান হাতের কাছে থাকলে সহজেই র্যাডম সংখ্যা পাওয়া যাবে!

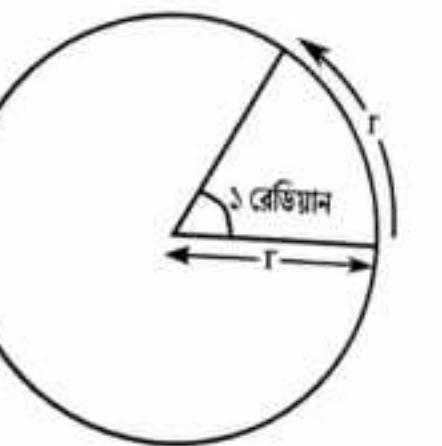
ধরা হয় কেন? পাইয়ের মান তো  $3.1415926\dots$ ।

### কোণের ক্ষেত্রে পাইয়ের মান ১৮০ ডিগ্রি কীভাবে?

তৃতীয় বলল, ১৮০ ডিগ্রি হলো পাই রেডিয়ান। এখানে সম্পর্কটা ডিগ্রি আর রেডিয়ান, এই দুইটা এককের। যেমন  $1 \text{ ফুট} = 12 \text{ ইঞ্চি}$ , তাহলে কি ১ আর  $12 \text{ সমান}$ । তা তো নয়।

আর পাই রেডিয়ানের ব্যাপারটা এসেছে রেডিয়ান কোণের সংজ্ঞা থেকে। রেডিয়ান যদি বুঝতে চাই তাহলে আসলে অবশ্যই বৃত্ত লাগবে। কারণ রেডিয়ানের পরিমাপটাই হচ্ছে বৃত্তীয় পরিমাপ।

মনে করো এটা একটা বৃত্ত যার বৃত্তের ব্যাসার্ধ  $= r$ । ধরো, আমার খুব ইচ্ছে হলো যে আমি এই বৃত্তের পরিধি বরাবর বাঁকা পথ ধরে বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান দূরত্ব অতিক্রম করব। তখন কেন্দ্রে যে কোণটা উৎপন্ন হবে, সেই কোণটাকে বলে ১ রেডিয়ান। এটাকে ছোট হাতের ৫ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



এখনকার হিসাবটা আমাদের আরও সোজা।

চাপ যখন  $r$ , তখন কোণ হবে ১ রেডিয়ান

চাপ যখন ১, তখন কোণ হবে  $1/r$  রেডিয়ান

চাপ যখন  $2\pi r$ , তখন কোণ হবে  $2\pi r/r = 2\pi$  রেডিয়ান।

$2\pi r$  তো বৃত্তের পরিধি। তাহলে চাপ  $2\pi r$  হওয়ার মানে পুরো বৃত্তটাই ঘোরা হয়ে গেছে। ডিগ্রিতে বললে এটাই ৩৬০ ডিগ্রি। ৩৬০ ডিগ্রি মানে  $2\pi$  রেডিয়ান। পরিধির অর্ধেক নিয়ে ভাবলে পাবে, ১৮০ ডিগ্রি মানে  $\pi$  রেডিয়ান।

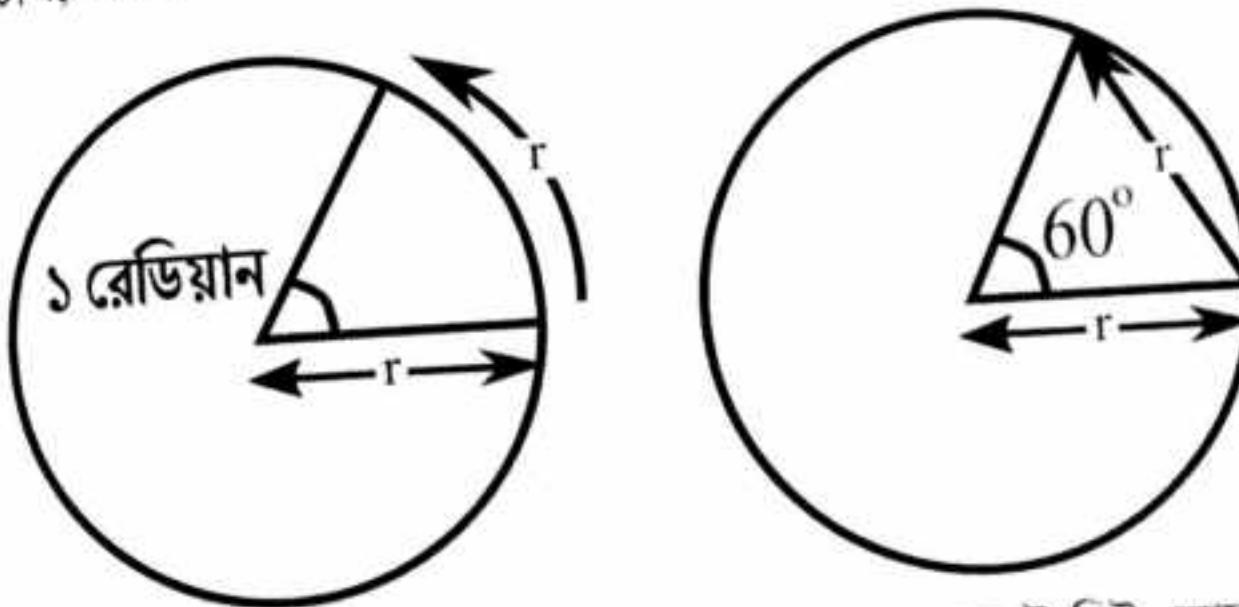
**রেডিয়ান কোণ কী?** ভাইয়া, আপনি বললেন বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান চাপ বৃত্তের কেন্দ্রে যে কোণ তৈরি করে সেটাই

এক radian বলে। ক্যালকুলেটরে এক radian-কে degree-তে নিলে পাই ৫৭.২৯৫৭৭৯৫১, কিন্তু কম্পাস দিয়ে আঁকার পর মাপলে হয় ৬০ ডিগ্রি, এর কারণ কী? এখানে আসলে কী হচ্ছে?

তৃতীয় বলল, আমাদের আঁকানোতে ভুল শেখানো হয়, আসলে এক রেডিয়ান কোণ রূলার এবং কম্পাস দিয়ে আঁকা যায় নয়।

এক রেডিয়ান কোণ কি আদৌ পেনসিল-কম্পাসে আঁকা যায়?

রেডিয়ান কোণের বেলায় যখন আমরা বলি, বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান চাপ, তখন বোঝায় ওই চাপটা মানে বাঁকা পথটার দৈর্ঘ্য  $r$ -এর সমান।



কিন্তু আমরা যখন কম্পাস দিয়ে  $r$ -এর সমান করে কেটে নিই, আমরা বাঁকা পথটা মাপতে পারি না। মাপি চাপের দুই মাথার দূরত্ব। সেটা কিন্তু চাপের দৈর্ঘ্য না; বরং ওই দুই প্রান্ত যোগ করলে যে জ্যা পাওয়া যাবে তার দৈর্ঘ্য। আবার বলছি, কম্পাস দিয়ে এখানে আমরা একটা জ্যা-এর দৈর্ঘ্য মাপি, চাপের না। জ্যা-এর মাথা দুইটা যোগ করে দিলে ভালো করে বোঝা যাবে কী হচ্ছে ব্যাপারটা। বলে পাশাপাশি দুইটা বৃত্ত একটাতে এক রেডিয়ান আর অন্যটায় ৬০ ডিগ্রি একে বোঝাল ভাইয়া। জ্যা-এর দৈর্ঘ্য যদি ব্যাসার্ধের সমান হয়, তখন আমরা আসলে পাই একটা সমবাহু ত্রিভুজ। ওই জ্যা-এর দুই মাথা থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত এমনিতেই ব্যাসার্ধ। আবার জ্যাটাও ব্যাসার্ধের সমান। তিনটে বাহুই সমান। পেলাম সমবাহু ত্রিভুজ, যার প্রতিটা কোণ ৬০ ডিগ্রি। ফলে আমরা আসলে আঁকি ৬০ ডিগ্রি, যেটা মোটেও রেডিয়ান কোণ নয়।

তাহলে রেডিয়ান কীভাবে আঁকব তাহলে?  
বৃত্তাব কীভাবে?

রুলার, কম্পাস দিয়ে সম্ভব নয়। চাঁদা দিয়ে ৫৭ ডিগ্রির কাছাকাছি আঁকা  
যেতে পারে।

এবারে আরেক ধরনের কোণের কথা মাথায় এল তবীর, ভাইয়া, আমার  
সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারে লেখা আছে D,R,G। এখানে D মানে  
Degree, R মানে Radian, কিন্তু G তে কী হয়?  
ও আচ্ছা, G মানে gradian।

## থ্রেডিয়ান জিনিসটা আসলে কী?

## থেডিয়ান আসলে কী?

এটা আসলে খুব সহজ জিনিস, আমরা জানি  
এক সমকোণ হলো ৯০ ডিগ্রি। যদি এই

সমকোণকে ১০০টা সমান ভাগে আমরা ভাগ করে ফেলি, তখন এই প্রতিটা ভাগকে বলে এক একটা গ্রেডিয়ান। অর্থাৎ ১ সমকোণ = ১০০ গ্রেডিয়ান।

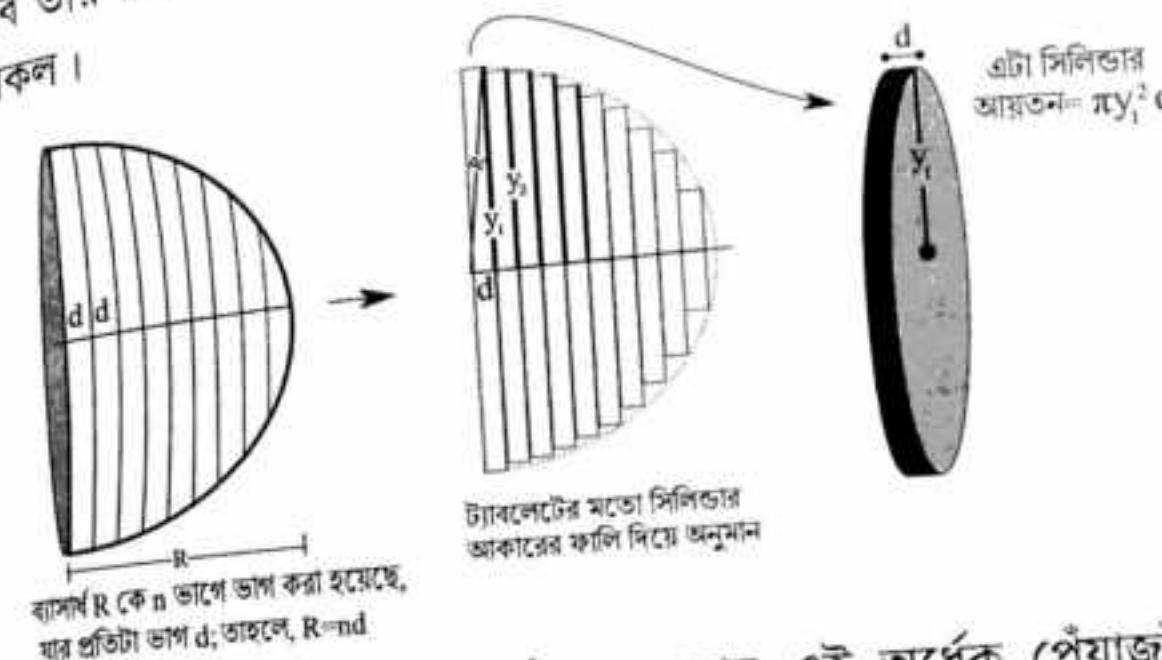
মেট্রিক পদ্ধতি যখন আবিষ্কার হলো, তখন মানুষ দশ দশ নিয়ে চিন্তা করত, দশ, এক শ, এক হাজার। তখন তারা এক সমকোণকে এক শ ভাগে ভাগ করার চিন্তা করেছিল। এটাকে বলা হতো ১ গ্রেডিয়ান বা এটাকে এখন 1 gon-ও বলে। প্রকৌশলে সার্ভে বলে একটা ব্যাপার আছে। সেই কাজ করার সময় কিছু ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার হয়। তা ছাড়া এটা খুব ব্যবহৃত হয় না।

কোণ আর বৃত্তের আলোচনা দেখতে দেখতে বান্টির মনে পড়ল,  
প্রথম দিন ভাইয়া বলেছিলেন, গোলকের আয়তনের ব্যাপারটা বুঝিয়ে  
দেবেন। স্মরণ করিয়ে দিতে অঙ্ক ভাইয়া বললেন,

## ପୋଲକେର ଆମାତନ ଓ ପୌରୀଜକ୍ଷୁଟି ପଦ୍ଧତି

গোলকের আয়তন ও  
স্পেজিয়ালিস্ট পজিশন  
এটা অনেকভাবে চিন্তা করা যায়। তোমাদের  
বলি পেঁয়াজ-কুচি পদ্ধতিতে কী করে গোলকের  
আয়তন বের করে সেটার কথা। আমার  
চাচাতো ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে বাবুচি বড় বড় পেঁয়াজ কাটছিল।  
ওটা দেখে এই ধারণাটা আমার মাথায় আসে। তোমাদের বোঝাই।

মনে করো পেঁয়াজটা সুষম গোলকাকৃতির। শুরুতেই পেঁয়াজটাকে  
অর্ধেক করে নিলাম। অর্ধেক আয়তন যদি বের করতে পারি, পুরোটা  
হবে তার দ্বিগুণ। এবার ছবি এঁকে বোঝাই। বলে ভাইয়া একটা ছবি  
আঁকল।



যার প্রতিটো ভাগ d; তাহলে,  $R=nd$   
মনে করো, গোলকের ব্যাসার্ধ R। এবার এই অর্ধেক পেঁয়াজটাকে  
আমরা ছবির মতো করে ফালি ফালি করব। ধরো, R ব্যাসার্ধের  
অর্ধপেঁয়াজটাকে আমরা nটা সমান পুরুত্বের ফালি করলাম। প্রতিটা  
ফালির পুরুত্ব d। তাহলে বলা যায়,  $nd=R$ । সবাই মাথা ঝাঁকায়, এটুকু  
বোঝা যাচ্ছে।

এবার দেখো আমাদের কাছে nটা পেঁয়াজ ফালি আছে। একেকটা ফালি  
দেখতে প্রায় সিলিঙ্গারের মতো।

নাকি ভাইয়া, অ্যান্টাসিড ট্যাবলেটের মতো

হায়রে কল্পনা রে! আচ্ছা যাও, তা-ই ধরলাম। দেখো, প্রতিটার ব্যাসার্ধ কিন্তু একই না। প্রথমটা একটু বেশি, এরপর আস্তে আস্তে কমছে। ধরো এই ব্যাসার্ধগুলো হচ্ছে  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  এমন করে করে  $y_n$ । প্রথম ফালির দিকে দেখো। বলে ভাইয়া অর্ধগোলকটার পাশে প্রথম ফালিটাকে আলাদা করে আঁকলেন।

এটার ব্যাসার্ধ  $y$ , আর পুরুত্ব  $d$ , তাহলে আয়তন কত হবে?

তথী ঝটপট উক্তর দিল, এটাকে যদি সিলিভার ভাবা যায়, আয়তন হবে  
 $\pi y^2 d$ ।

চমৎকার! তাহলে পুরো অর্ধগোলকের আয়তন হবে এমন সবগুলো ফালির যোগফল—

## অর্ধগোলকের আনুমানিক আয়তন

$$= \pi y_1^2 d + \pi y_2^2 d + \pi y_3^2 d + \dots + \pi y_n^2 d$$

$$= \pi d (y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + \dots + y_n^2)$$

কিন্তু এই যে বললাম  $y_1$ , এটার কিন্তু আরেকটা পরিচয় আছে, যেটা  
পিথাগোরাসের উপপাদ্য থেকে বের করা যায়। অর্ধপেঁয়াজের ছবিতে  
বাম পাশে খেয়াল করো, বাঁকা করে একটা দাগ দিয়েছি, মাঝে লিখেছি  
 $R$ । কেন্দ্র থেকে গোলকের গায়ের যেকোনো বিন্দুর দূরত্বই তো  $R$ ,  
তাই না? তাহলে পিথাগোরাস থেকে পাব—

$$R^2 = y_j^2 + d^2 \Rightarrow y_j^2 = R^2 - d^2$$

এবার  $y_2$ -এর কথা ভাবো। এবার নিচে থাকবে  $2d$ ।  
 এটাকেও একইভাবে লেখা যায়  $y_2^2 = R^2 - (2d)^2$ ।  
 একইভাবে আমরা পাব,  $y_3^2 = R^2 - (3d)^2$ , এমন করে  
 $y_n^2 = R^2 - (nd)^2$ , সবগুলো বসিয়ে দিলে আমরা পাব,

## অর্ধগোলকের আনুমানিক আয়তন

$$\begin{aligned}
 &= \pi d(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + \dots + y_n^2) \\
 &= \pi d\{R^2 - d^2 + R^2 - (2d)^2 + \dots + R^2 - (nd)^2\} \\
 &= \pi d\{nR^2 - d^2(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2)\} \\
 &= \pi d\{nR^2 - \frac{d^2 n(n+1)(2n+1)}{6}\}
 \end{aligned}$$

এখানে ধারার একটা সূত্র ব্যবহার করেছি, প্রথম “সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের যোগফলের সূত্র। এটার প্রমাণ আপাতত বোঝাচ্ছি না। তবে বলে রাখি এটাকে বীজগণিত ছাড়াই দেখে দেখে *Feel* করা যায়। আবার দেখি—

## অর্ধগোলকের আনুমানিক আয়তন

$$= \pi d \left\{ nR^2 - \frac{d^2 n(n+1)(2n+1)}{6} \right\} = \pi n d R^2 - \frac{\pi d^3 n(n+1)(2n+1)}{6}$$

এবারে মনে রেখো  $nd=R$ , বা  $d=\frac{R}{n}$ ।  $d$ -এর এই মান বসালে পাবে  
অর্ধগোলকের আনুমানিক আয়তন

$$= \pi n d R^2 - \frac{\pi d^3 n(n+1)(2n+1)}{6} = \pi R^3 - \frac{\pi R^3 n(n+1)(2n+1)}{n^3}$$

আমরা খুব কাছাকাছি! পরের রাশির  $n^!$  কে  $n(n + 1)(2n + 1)$  এদের প্রত্যেকের তলায় আলাদা করে নিয়ে যাই। কেন যাচ্ছি, সেটা বলব।

### অর্ধগোলকের আনুমানিক আয়তণ

$$= \pi R^3 - \frac{\pi R^3}{6} \left(\frac{n}{n}\right) \left(\frac{n+1}{n}\right) \left(\frac{2n+1}{n}\right) = \pi R^3 - \frac{\pi R^3}{6} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right)$$

$n/n$  কেটে দিয়েছি। খেয়াল করো, আমরা এখানে যে আয়তন পেলাম,  
সেটা আসলে আনুমানিক। কারণ পেঁয়াজ ফালিগুলো ঠিক ঠিক সিলিন্ডার  
ছিল না, তাদের ধারগুলো গোলকের মতো বাঁকানো। কিন্তু যদি আমরা  
পেঁয়াজটাকে আরও অনেক অনেক ভাগে ভাগ করতাম, তাহলে তাদের  
পুরুষ্ট কমত, তারা আরও নিখুঁত আয়তন দিত। একেবারে ঠিক আয়তন  
পেতাম যখন ভাগসংখ্যা হতো অসীম বা  $n \rightarrow \infty$ , সে ক্ষেত্রে  $\frac{1}{n}, \frac{2}{n}$   
এরা হয়ে যেত শূন্য। এই মানগুলোকে বসালে পাব সঠিক আয়তন।

অর্ধগোলকের সঠিক আয়তন

$$= \pi R^3 - \frac{\pi R^3}{6} (1 + 0)(2 + 0) = \pi R^3 - \frac{\pi R^3}{6} \times 2 = \pi R^3 - \frac{\pi R^3}{3} = \frac{2\pi R^3}{3}$$

$$\text{অতএব পুরো গোলকের আয়তন} = 2 \times \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{3} = \frac{4}{3}\pi R^3$$

সবাই স্বত্তির নিশ্চাস ফেলল । মনে হলো একটা বিরাট বোকা নামল ।

ভাইযা বললেন, অন্য কাউকে অঙ্ক করতে দেখলে অনেক সময় মনে হয় কী কঠিন ব্যাপার। আমি যে লাইনগুলো লিখলাম, তুমি যদি নিজে একবার এই লাইনগুলো লেখো, বিশ্বাস করো পুরোটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এরপর ভাইয়া বললেন ঠিক একইভাবে বর্ণকার ভূমিবিশিষ্ট একটা পিরামিডের আয়তনও বের করা যায়, যার মান হয়  $\frac{1}{3} \times$  উচ্চতা  $\times$  ভূমির ক্ষেত্রফল। এবং এই দুটো তথ্য ব্যবহার করে দেখানো যায়।

তৃষ্ণ জানায়, এই যে নিয়মটা তোমাদের দেখালাম— এটাকে আমি বলি শিশু ক্যালকুলাস। তোমরা পরের ক্লাসে উঠে ক্যালকুলাস শিখবে। এটা আধুনিক গণিতের অসাধারণ এক হাতিয়ার। এখানে আমি ক্যালকুলাসের ধারণাই ব্যবহার করেছি, তবে কোনো সূত্র ব্যবহার করিনি। এ জন্যেই এটাকে বলি শিশু ক্যালকুলাস।

বহুদিন ওদের কোনো নতুন সমস্যা দেননি অঙ্ক ভাইয়া। আজ দিলেন। তোমরা কি শিশু ক্যালকুলাস পদ্ধতিতে কোণকের আয়তনের সূত্রটা বের করতে পারবে? মাথাভর্তি চিন্তা নিয়ে ওরা বাসায় ফিরল।

তৃষ্ণ ভাবে, এই চিন্তা করাটাই জরঁরি, উভর পাওয়ার থেকেও বেশি। গন্তব্য নয়, পথটাই আসল!

অধ্যায় ৭

## সুরের মায়ায় বাঁধা যখন গণিত

### ৭.১

আজও বাসায় ফিরতে দেরি হলো তৃষ্ণের— বন্ধুদের সাথে একটা গানের আড়তায় ডুবে গিয়েছিল। তৃষ্ণের বন্ধু তন্ময় দারুণ গান করে, গিটার বাজিয়ে। কলেজের মাঠের এক কোনায় বসে ও গান করছিল। সাথে গলা মেলাচ্ছিল বাকিরা। তৃষ্ণের নিজেরও গান নিয়ে অনেক আগ্রহ। গিটার কিনেছিল শখ করে, দুটো একটা কর্ড শেখার পর ও টের পেয়েছে গিটারের সংগীতের থেকে ওর বেশি আগ্রহ গিটারের গণিতের প্রতি। গণিতটা কিছুটা বোঝা হয়েছে, এখন গিটারে জমছে ধুলো।

গানে-আড়তায় তৃষ্ণ ভুলেই গিয়েছিল তন্বী-বান্টিরা যে পড়তে আসবে— সেটার কথা। আড়তা থেকে ফিরে সাইকেলটা রেখে বাসায় ঢুকবে, এমন সময় একটা মিহি গলার আওয়াজ শুনতে পেল ও। কেউ খুব সুন্দর করে নজরঞ্জলসংগীত গাইছে, ‘যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পারো নাই, কেন মনে রাখো তারে...’। ও দরজায় বাইরে অপেক্ষা করে কিছুক্ষণ। গানটা শেষ হতেই ভেতরে ঢোকে। দেখে টিনা, বান্টি আর ওর মা তালি দিচ্ছেন। আর পৃথী মুক্তি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তন্বীর দিকে। তন্বীই যে গাইছিল বুঝতে পারে তৃষ্ণ।

বাহ, তুমি তো খুব সুন্দর গান করো।

টিনা বলে, জি ভাইয়া, তন্বী আমাদের ক্লাসের ফিরোজা বেগম।

কী দারুণ! আজকে আমার দিনটা বেশ সংগীতময় যাচ্ছে। থামলে কেন

<sup>8</sup> বর্তমান লেখকের গণিতের রঙে: হাসিখুশি গণিত (৩য় সংস্করণ) বইটির গোলকবাবু ও ঘ্যাচাঁ মাস্টার অধ্যায়ে আরও সহজ করে এই প্রশ্নাঙ্গলো দেয়া হয়েছে।

তবী, আরও শুনি ।

তৰী লজ্জা পেয়ে যায়, ভাইয়া, আরেক দিন!

আচ্ছা, তোমরা কী জানো এই গান ব্যাপারটাও কী দারত্তণ গণিতময়?

পৃথী অবাক গলায় বলে, বলেন কী, সত্যিই?

হ্যাঁ। ছেলেবেলায় ভাবতাম যারা গান ভালোবাসে, তারা অন্য জগতের মানুষ, তাদের চিন্তায় সুর-শব্দ-কথার ঝংকার। আর যারা বিজ্ঞানী মানুষ, তাদের জগৎটা একেবারেই আলাদা— নানান রকম যন্ত্রপাতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর সেই সাথে গণিতময় নানান তত্ত্ব। তখন ভাবতেও পারিনি গণিতের সাথে কী দারুণ স্থ্য সংগীতের। আজ আমরা জানি সংগীতের যত বাদ্যযন্ত্র, যত ব্যাকরণ— তাদের মাঝে কত নিবিড়ভাবেই না জড়িয়ে আছে গণিত!

গানের সাথে গণিতের সম্পর্ক  
কবে থেকে জানে মানুষ?      মানুষ গান আর গণিতের ভেতর  
সম্পর্ক কীভাবে বের করল?

সেই গল্পটাও মজার । তাকে তোমরা চেনো । এখন থেকে প্রায় আড়াই  
হাজার বছর আগের কথা । এই সময়টাতে প্রাচীন গ্রিসের সামোস দ্বীপে  
জন্ম নিয়েছিলেন এক মহা মনীষী, যার চিন্তাভাবনা ছিল খুবই অভূত  
রকমের । তিনি বলতেন, এই পৃথিবীর সবকিছুকে নাকি সংখ্যা দিয়ে  
প্রকাশ করা যায়, এমনকি মানুষের আত্মাকেও । তিনি হলেন মহান  
পিথাগোরাস, যার উপপাদ্যের কথা সেদিন তোমাদের বলছিলাম । তো  
পিথাগোরাস শুধু বলেই ক্ষান্ত হলেন না, এমন অনেক কিছুকে তিনি  
সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করে দেখালেন যে, সবাই তাজ্জব বনে গেল ।

একবার নাকি তিনি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলেন একটা কামারের দোকানে চারজন কামার চারটা হাতুড়ি দিয়ে লোহা পেটাচ্ছে। হাতুড়ির আওয়াজ একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর শোনা যাচ্ছে— মনে হচ্ছে যেন কেউ বাদ্য বাজাচ্ছে। এটা শুনেই তার মাথায় চিন্তা এল, আচ্ছা সংগীতকে কি কোনোভাবে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায়? শুরু ভাবনায় পড়ে গেলেন। এরপর নিয়মিত সেই কামারের দোকানে গিয়ে গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করা শুরু করলেন। তিনি খেয়াল করলেন

চারজনের হাতুড়ির আকার আলাদা আলাদা এবং চারজনের উৎপন্ন  
শব্দও আলাদা রকমের। তিনি দেখলেন দুইটা হাতুড়ি যখন একসাথে  
পড়ে কখনো কখনো শুনতে ভালো লাগে আবার কখনো খুবই শৃঙ্খলিকটু  
লাগে। তিনি দেখলেন সবচেয়ে বড় আর মাঝারি বড় একসাথে বাজলে  
লাগে না, মাঝারি বড় আর মাঝারি ছোট—এগুলো  
শুনতে ভালো লাগে না, মাঝারি ছোট একসাথে বাজলেও শুনতে ভালো লাগে।  
মাঝারি ছোট এই দুটো একসাথে শব্দ করলে শুনতে ভালো লাগে!  
আবার সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে বড়টা যখন একসাথে বাজে, মনে  
হয় যেন দুজন একেবারে ঠিক সুরে গলা মিলিয়ে গান গাইছে। এরপর  
অঙ্ক কয়ে পিথাগোরাস বের করে ফেললেন আকারের সাথে সুরের  
সম্পর্ক আর তারপর সুরের সাথে সুর মেলানোর গণিত! তার প্রায়  
দুই শব্দ বছর পর গ্রিসেরই আরেক দার্শনিক অ্যারিস্টোজেনাস সংগীতের  
ওপর একটা বিশাল বই লিখে ফেলেন: যার নাম ছিল Elementa  
Harmonica। এই বইটিতেই তিনি দেখিয়ে দিলেন সংগীতের পুরো  
ব্যাপারটাই আসলে গণিতে মোড়া!

ব্যাপারটা আসলে কী? বিজ্ঞান কী বলে,  
আচ্ছা ভাইয়া, গণিতিকভাবে চিন্তা করলে গান  
ব্যাপারটা আসলে কী?

এভাবে শুনতে হয়তো খুব কাঠখোটা লাগবে, তবুও বলি, সংগীত  
আসলে এক প্রকার শক্তির প্রকাশ, যাকে আমরা বলি শব্দশক্তি! একটা  
একতারার তার যখন আমরা টুং করে নাড়া দিই, তারটা নিজে কাঁপাব  
সময় কাঁপিয়ে যায় তারের চারপাশের বাতাস। সেই বাতাস নাড়িয়ে  
দেয় আমাদের কানের পর্দাটা আর পর্দার কাঁপুনিটা রাসায়নিক আর  
বিদ্যুৎ শক্তি হয়ে পৌছে যায় আমাদের মস্তিষ্কে। আর তখন আমাদের  
মনে হয় কিছু একটা শুনতে পেলাম। ওই শব্দটা আমাদের কানে আসার  
পথে বাতাসকে প্রতি সেকেন্ডে কতবার সামনে-পেছনে করে কাঁপিয়েছে,  
সেটাকে বলে শব্দটার কম্পাঙ্ক। এই কম্পাঙ্কটাই হলো মূল ব্যাপার।  
এটাই নির্ধারণ করে দেয় শব্দটা শুনতে কেমন হবে। কম্পাঙ্ক যত বেশি  
হবে, তত শব্দটা শুনতে চিকন মনে হবে। সাধারণত মেয়েদের গলার  
কম্পাঙ্ক ছেলেদের চেয়ে বেশি। ছেলেরা সাধারণভাবে কথা বলার সময়  
বাতাসকে কাঁপায় সেকেন্ডে ৮৫ থেকে ১৮০ বার। আর মেয়েরা কাঁপায়

১৬৫ থেকে ২৫৫ বার। কথা বলার সময় কিংবা বাদ্যযন্ত্র বাজানোর সময় আমরা নানান কম্পাক্ষের শব্দ করি আর সেগুলোই আমাদের কান দিয়ে মন্তিক্ষে গিয়ে নানা রকম অনুভূতির সৃষ্টি করে। সত্যতার একটা পর্যায়ে গিয়ে মানুষ বুঝতে শিখল কিছু শব্দ একটার পর একটা শুনলে কিংবা একসাথে একটা ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি হয়। শব্দশক্তি থেকে তখন জন্ম হলো সংগীতের।

**সা-রে-গা-মা-র গণিত** সা দিয়েই তো সব গান। এগুলোকে মৌলিক সংখ্যার মতো ভাবা যায়?

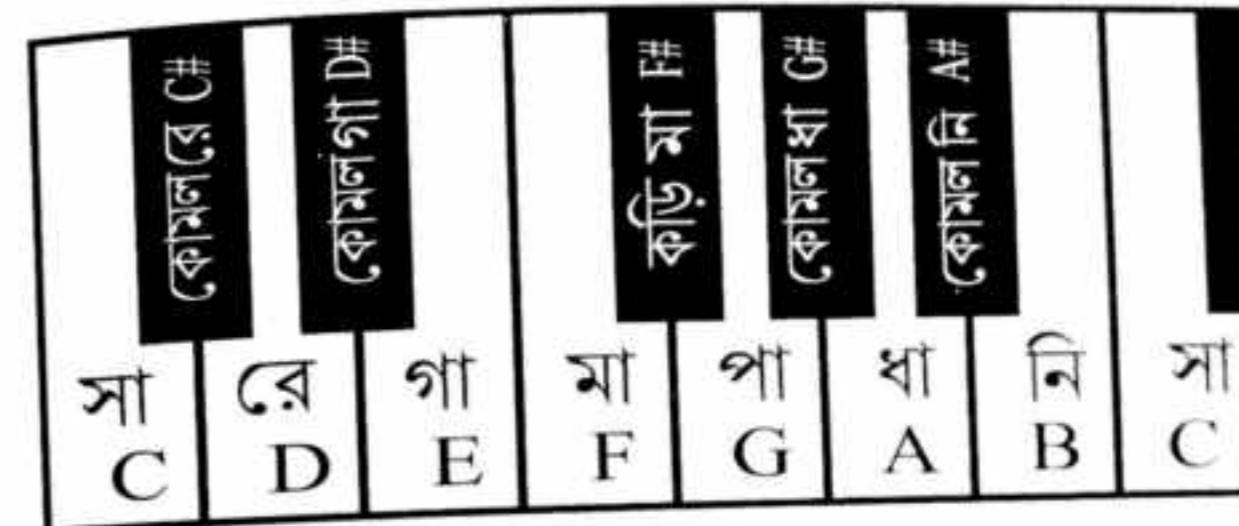
ভাবতে পারো, সংগীতের মূল কাজ এদের নিয়েই। এদের বলে একেকটা স্বর বা note। আরও ভালো করে বললে এরা হলো শুন্দি স্বর। এটুকু বলে ভেতরে চুকল, বের হয়ে এল একটা হারমোনিয়াম নিয়ে। এটা মায়ের হারমোনিয়াম।

বলেন কী, আন্টি গান করেন!

করতেন একসময়, বছদিন, আমরা আর কেউ শুনিনি। একটু বিষণ্ণ শোনায় তৃর্যের গলার স্বর। এরপর ও বলে, হারমোনিয়ামের দিকে ভালো করে তাকালে দেখবে নিচে সারি সারি সাদা বোতাম, আর ওপরে একবার দুইটা কালো বোতাম, তারপর একটু ফাঁকা রেখে তিনটে কালো বোতাম। দুইটা কালো বোতাম যেখানে সেটার বাম পাশেরটার ঠিক নিচের সাদা বোতামটাকে ইংরেজিতে বলে C note। এখান থেকেই সাধারণত ‘সা’ বাজানো হয়; যদিও আসলে সা রে গা মা সব জায়গা থেকেই শুরু করে বাজানো যায়। এখান থেকে শুরু করে পরপর সাদা বোতামগুলো বাজিয়ে গেলেই সা রে গা মা পরপর বাজতে থাকবে। এখান থেকে ভাবলে ইংরেজিতে সা রে গা মা পা ধা নি হলো C, D, E, F, G, A, B। ওপরের যে কালো বোতামগুলো এরাও কিন্তু কম শুরুত্বপূর্ণ নয়। এরা হলো কোমল রে (ঝ), কোমল গা (জ্ঞ), কড়ি মা (শ্ব), কোমল ধা (দ) এবং কোমল নি (ণ)। ঠিক বলেছি না, তবী?

তবী সায় জানাল, জি ভাইয়া!

ইংরেজিতে এদের Sharp বলে (যেমন C# মানে হলো C Sharp)। এদের যদিও বিকৃত স্বর বলে, এরাও মূল স্বরের সমান শুরুত্বপূর্ণ। ৭টি শুন্দি আর ৫টি বিকৃত এই মোট ১২টি স্বর হলো সব সংগীতের মূলে। এরপর আবার সা রে গা মা শুরু হয়ে চলতে থাকবে (ছবিটাতে একটু দেখে নিতে পারো হারমোনিয়ামে কোন বোতামটাকে কী বলে)।



এবার একটু গণিত— তুমি যখন হারমোনিয়ামের মধ্যখানে সা (C) বাজাও, এর কম্পাক্ষ হলো ২৬২ হার্জ, মানে তখন বাতাস সেকেভে ২৬২ বার কাঁপে। অন্য স্বরগুলোর কম্পাক্ষ এমন—

স্বর	C	C#	D	D#	E	F	F#
কম্পাক্ষ	২৬২	২৭৭	২৯৪	৩১১	৩৩০	৩৪৯	৩৭০
স্বর	G	G#	A	A#	B	C	
কম্পাক্ষ	৩৯২	৪১৫	৪৪০	৪৬৬	৪৯৪	৫২৪	

একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবে, আবার যখন C শুরু হয়েছে, তখন সেটা হয়ে গেছে প্রথমটার দুই গুণ ( $262 \times 2 = 524$ )। একইভাবে এর পরের C# টা হবে আবার ২৭৭-এর দুই গুণ। দুইটা C শুনতে একই রকম, শুধু একটা একটু মোটা গলা আর একটা চিকন। যেটার কম্পাক্ষ কম সেটা মোটা শোনায়। সংগীতে সেটাকে বলে নিচ স্বর।

এবার বান্টি জিজেস করল, তাহলে, টিভিতে যখন সংগীত প্রতিযোগিতার বিচারকেরা বলে, আরেকটু উচু ক্ষেলে গাও, তার মানে কি আরেকটু বেশি কম্পাক্ষে গাইতে বলছে?

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। দাঁড়াও আরেকটু বোঝাই তোমাদের! বলে সে তার গিটার নিয়ে এল। গিটার ভর্তি ধূলো।

বান্টি টিটকারি দিল, ভাই, এটা কি আসলেই বাজে?

হা হা হা, মনে হয় বাজবে, একটু টিউন করতে হবে। বলে সে তার ফোন বের করে ফোনের সাহায্যে গিটারটাকে টিউন করল। এটা কী করলেন ভাইয়া?

টিউন করলাম, কোন তারে টোকা দিলে কী কম্পাক্ষের আওয়াজ বের হবে সেটা নির্দিষ্ট করা আছে। অনেক দিন না বাজানোর ফলে সেটা আর ওই নির্দিষ্ট কম্পাক্ষে বাজছে না। এখন তারগুলো টাইট আর চিলা করে ঠিক কম্পাক্ষে নিয়ে এলাম। বলে সে একসাথে সবগুলো তার বাজাল, সুন্দর একটা আওয়াজ হলো।

এটা কী বাজালেন, ভাইয়া?

### এ মাইনর কর্ড কী জিনিস?

একসাথে বাজালে যখন শুনতে ভালো লাগে তাকে বলে কর্ড। এবারে তোমাদের বলি গাণিতিকভাবে এটা কী বোঝায়।

পিথাগোরাস লক্ষ করেছিলেন যে কিছু কিছু স্বর একসাথে বাজালে শুনতে ভালো লাগে। যেমন একটা C-এর সাথে তার পরের C পরপর বাজালে শুনতে ভালো লাগে। যদি আমরা বিকৃত বা sharp-গুলোকে বাদ দিয়ে শুধু শুন্দি স্বরগুলো শুনি তাহলে দেখব একটা C-কে ১ নম্বর ধরলে পরের C-টা হবে ৮ নম্বর। এ জন্য এদের বলে অষ্টেন বা অষ্টক। এদের কম্পাক্ষের অনুপাত হয় ২:১।

পিথাগরাসের শিষ্যরা আরও দেখেছিলেন শুন্দি স্বর নিয়ে ভাবলে ‘চতুর্থ’ আর ‘পঞ্চম’-এর সাথে ভালো মিল হয়। অর্থাৎ ১ নম্বরের সাথে ৪ নম্বর (যেমন: C-এর সাথে F কিংবা E-এর সাথে A) এবং ১ নম্বরের সাথে ৫ নম্বর (যেমন C-এর সাথে G কিংবা D-এর সাথে A) স্বরগুলো

একসাথে বাজলে সেটা শুনতে শৃঙ্খিমধুর লাগে। পিথাগোরাস ছোট ছোট পূর্ণসংখ্যার সরল অনুপাতের ব্যাপারটা একটু বেশি ভালোবাসতেন। তাই ১ নম্বরের সাথে ৪ নম্বর যে মিলবে কেননা ৩৪৯/২৬২ প্রায় ৪/৩-এর সমান। আবার ১ নম্বরের সাথে ৫ নম্বরের বেলায়ও এটা ৩/২-এর খুব কাছকাছি। ৩৯২/২৬২ প্রায় ৩/২-এর সমান। সংগীতে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত দুই ধরনের কর্ড হলো মেজর কর্ড আর মাইনর কর্ড।

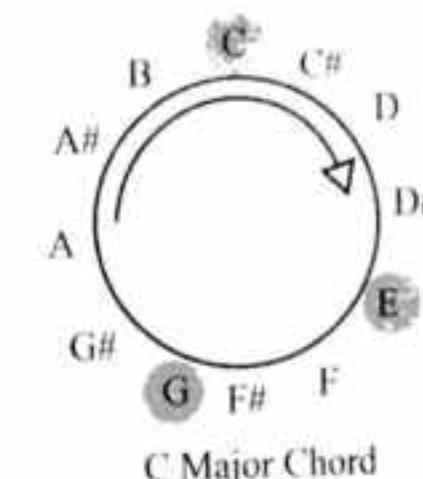
চলো তোমাদের গিটারের একটু জ্ঞান দিই। মনে আছে তো, শুন, বিকৃত স্বর মিলিয়ে মোট ১২টা নোট বা স্বর আছে? হ্যাঁ, ভাইয়া।

এবার ওদের সবাইকে নিয়েই ভাবব। যেকোনো একটা স্বরকে আমরা যদি ১ নম্বর বলি, তখন শুন্দি, বিকৃত মিলিয়ে ৫ নম্বরে যে আছে আর ৮ নম্বরে যে আছে, এই ১-৫-৮ তিনটা স্বরকে যদি একসাথে বাজাই, আমরা পাব মেজর কর্ড। বলে সে একটা ছবি আঁকল।

এই চক্রকার ছবিটাতে তাকালে ভালো বোঝা যাবে। যেমন C-কে যদি আমরা ১ নম্বর ভাবি, এরপর C# হবে ২, D হবে ৩, এমন করে আগালে E হবে ৫, আর G হবে ৮। তাহলে ১-৫-৮ হবে C—E—G। এদের যদি একসাথে বাজাই আমরা পাব C মেজর কর্ড। তাহলে বলো তো D sharp মেজর কী হবে?

ওদের একটু সময় লাগল, তবে ওরা ঠিকই খুঁজে বের করল। ওরা দেখল, D#-কে ১ নম্বর ধরলে ৫ আর ৮ নম্বর হবে G আর A#। সবাই ভেবেছিল তাহী সবার আগে পারবে, কিন্তু উভয় দিল পৃথী, ভাইয়া, এটা D#-G-A#।

বাহ দারুণ, এই তো তোমরা মেজর কর্ড বুঁৰে গেছ। এবার শোনো ঠিক একইভাবে ১-৪-৮ বাজালে পাবে মাইনর কর্ড। তাহলে A মাইনর কর্ড কী হবে বলো তো?

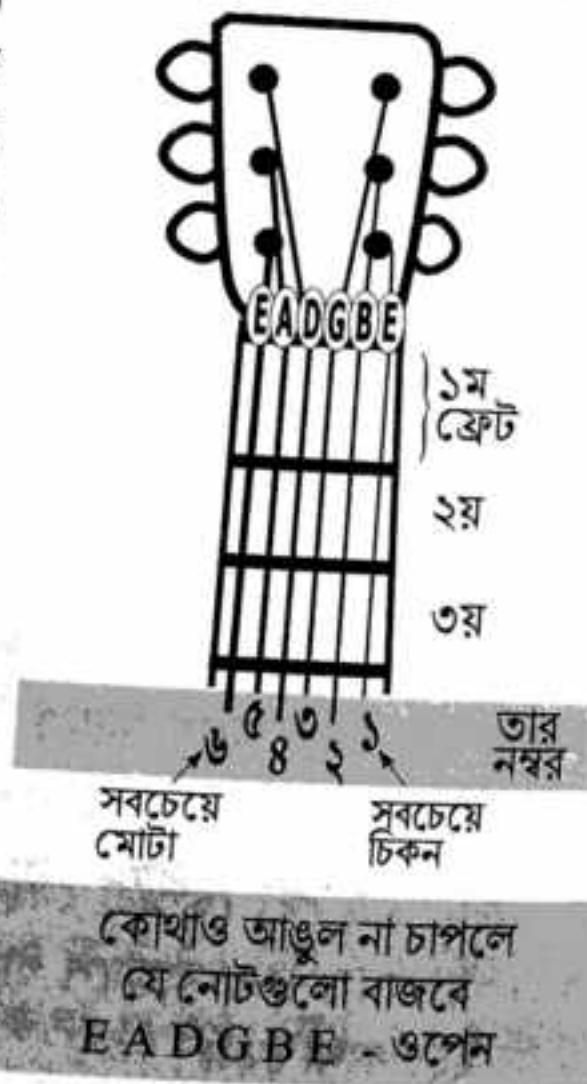


বান্টি বলল, A ১ নম্বর হলে ৪ নম্বর হবে C আর ৮ নম্বর হবে E, তাইলে A -C -E হবে এ মাইনর কর্ড। তাই না ভাইয়া?

ঠিক তাই। মজার বিষয় হচ্ছে, এরাও কিন্তু পিথাগোরাসের সরল অনুপাতের নিয়ম মানে। A এবং E মানে পঞ্চমের নিয়ম। গিটারে আমরা যখন একেকটা কর্ড ধরি, ঠিক এই চিন্তা থেকেই ধরা হয়। একেবারে যখন কিছুই ধরি না, তাকে বলে ওপেন— ছয়টা তারে তখন EADGBE এগুলো বাজতে থাকে। সবচেয়ে নিচের চিকন তারটাকে বলে ১ নম্বর তার আর ওপরের মোটা তারটা হলো ৬ নম্বর।

গিটারের ওপরের দিকে যেখানে আঙুলগুলো চেপে ধরে বাজায়, সেখানে খেয়াল করলে দেখবে কিছু পরপর দাগ দেওয়া আছে। এগুলোকে ফ্রেট বলে। এই একেকটা ফ্রেটে যখন আঙুল চেপে ধরি, তখন গিটারের ওই তারের মুক্ত অংশের দৈর্ঘ্য কমে যায়। আগে ছিল এ মাথা থেকে ও মাথা, এখন দৈর্ঘ্য হবে তুমি যেখানে আঙুল চেপে ধরেছ ওই পর্যন্ত। এমন হলে কম্পাঙ্ক বেড়ে যায়, তখন যেটা E ছিল সেটা হয়ে যায় F।

এখন দেখো, যখন কোনো আঙুলই চেপে ধরি না, তখন তারগুলোতে টোকা দিলে বাজে EADGBE। সবচেয়ে মোটা তারে E, এরপর A, তারপর D, এরপর G, B, এমন করে সবচেয়ে চিকন তারে আবার E। এখন যদি আমরা A



Minor বাজাতে চাই, আমাদের লাগবে A C E। ছয়টা তারেই এই নোটগুলোর ভেতর থেকেই একটা না একটা বাজতে হবে। তিনটা তারে দেখো আগে থেকেই হবে। সবচেয়ে মোটা বা ৬ নম্বর এগুলো আছে। সবচেয়ে মোটা বা ৬ নম্বর আর আঙুল চেপে ধরতে হবে না। কিন্তু আর আঙুল চেপে ধরতে হবে না। কিন্তু অন্যগুলো?

দেখো, ৪ নম্বর তারে কিছু না ধরলে পাবে D, কিন্তু এটা হলে তো A minor বাজবে না। যদি এই তারে প্রথম ফ্রেটে আঙুল চেপে ধরে বাজাও, বাজবে D-এর পরের নোটটা মানে, D#। এটাও A minor-এ নেই। এখন তার পরের ফ্রেটে আঙুল রাখি। D#-এর পরের নোট হলো E। বেশ, এটা আমাদের কর্ডে আছে। তাহলে এখানে একটা আঙুল চাপতে হবে।

এরপর ৩ নম্বর তারে কিছু না ধরলে পাবে G, কিন্তু এটা হলে তো A minor বাজবে না। যদি এই তারে প্রথম ফ্রেটে আঙুল চেপে ধরে বাজাও, বাজবে এ-এর পরের নোট G#। এটাও A minor-এ নেই। তাই তারও পরের ফ্রেটে আঙুল রাখি। G#-এর পরের নোট হলো A, এটা আমাদের কর্ডে আছে। তাহলে এখানে একটা আঙুল চাপতে হবে।

এরপর ২ নম্বর তারে কিছু না ধরলে পাবে B, কিন্তু যদি এই তারে প্রথম ফ্রেটে আঙুল চেপে ধরে বাজাও, বাজবে B-এর পরের নোট C। এটা A minor কর্ডে আছে। তাহলে এখানে আরেকটা আঙুল চাপতে হবে। এখন দেখো, ছয়টা তারে বাজছে E A E A C E। সবাই A minor কর্ডের কোনো না কোনো নোট। এভাবেই গিটারে A minor কর্ড ধরতে হয়। তোমাদের আগ্রহ থাকলে এখন যেকোনো কর্ড ধরতে পারবে। তবে...।

তবে কী ভাইয়া?



8 ও 3 নং তারে ২য় ফ্রেট, ২ নং তারে ১ম ফ্রেট চেপে বাজালে বাজবে E A E A C E - এর A Minor কর্ড

যদি চৰ্চা না করো, তাহলে আমার মতো অবস্থা হবে। গণিতটা জানবে ঠিকই, কিন্তু বাজাতে আর পারবে না!

সবাই হাসল। পৃথী বলল, গিটারের ভেতরেও যে এত অক্ষ এটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

সংগীতে যত ধরনের যন্ত্র আছে সেগুলোর প্রায় সবই নিখুঁত গণিতের হিসাব মিলিয়ে করতে হয়। পিয়ানোর পেছনে যে বাঁকা অংশ থাকে, সেটাকে গণিতের সূচকের লেখচিত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। একই ভাবে বাঁশিতে ছিদ্রগুলো করতে হয় হিসাব কষে নিয়ম মেনে। আসলে কমবেশি সব সংগীতযন্ত্রেই বিষয়টা এমন। গিটারের ফ্রেটগুলো ভালো করে খেয়াল করলে দেখবে ওপরের ফ্রেটগুলো বেশি চওড়া, তারপর আস্তে আস্তে এর প্রশস্ততা কমে গেছে। আসলে কম্পাঙ্ক ঠিক রাখার জন্য এমন ভাবে ফ্রেটগুলো চওড়া করা হয়, যেন যেকোনো একটা ফ্রেট থেকে ব্রিজ পর্যন্ত দূরত্ব হয় পরের ফ্রেট থেকে ব্রিজের দূরত্বের  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  গুণ!

ওরেক্বাবা।

এবার তবী যোগ করল, ভাইয়া, আমার মনে হয় সংগীতের ভেতর আরেকটা গণিতের জায়গা আছে, সেটা হলো গানের তাল।

অবশ্যই, স্বরগুলো যদি একটার পর একটা এলোমেলোভাবে কানে আসে তাহলে অনুপাত মানলেও আসলে শুনতে ভালো লাগে না। এ জন্য ঠিক কতক্ষণ পরপর স্বরগুলো কানে আসবে, সেটা নিয়মিত হওয়া দরকার। সময়ের সেই হিসাবটাই হলো তাল। তালের একেকটা অংশ ছোট হিসাব করা হয় মাত্রা দিয়ে। ৮ মাত্রার কাহারবা তাল, ৬ মাত্রার দাদরা, ১৬ মাত্রার ত্রিতাল আরও কত নাম। হিসাব কিন্তু থাকছেই, গণিত সাথেই আছে।

বান্তি খোঁচা দিল, কিন্তু ভাইয়া, যে লোক গান করছে তার কি এত অক্ষ জানার দরকার আছে? আপনার কি মনে হয় পড়শী, ইমরান এত অক্ষ করে গান করে?

হা হা হা, না, করে না। গান করার জন্য গণিত জানতে হবে, এটা আমি আসলে বলতে চাইনি। আমি শুধু এটা বলতে চাচ্ছিলাম, গানের

গভীরেও গণিত লুকানো আছে। তুমি শ্বাস নেওয়ার সময় কি বারবার ফুসফুসের কথা ভাবো? বেঁচে থাকার স্পন্দনের জন্য কি বারবার হৃৎপিণ্ডকে ধন্যবাদ দাও? দাও না, তবে তারা তাদের কাজ ঠিকই করে যায় বলে তুমি বাঁচো।

অবশ্য গণিত থেকে পাওয়া আরেকটা ব্যাপার এখন সংগীতে খুব জরুরি হয়ে গেছে। এখন এই সময়ের তরঙ্গ প্রজন্মের কাছে যেসব শিল্পী অনেক জনপ্রিয় তারা প্রায়ই সংগীত সৃষ্টিতে ব্যবহার করেন তাদের কম্পিউটারটিকে। এখন প্রযুক্তি এমন জায়গায় যে কোনো সংগীতযন্ত্র হাতে না বাজিয়েই শুধু একটা কম্পিউটারে কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করে পুরো সংগীত আয়োজন করে ফেলা যায়। শুধু সংগীতবিদদের দিয়ে কিন্তু এ কাজ সম্ভব হতো না। অসংখ্য সংগীতপ্রেমী গণিতবিদের বহু বছরের গবেষণার ফল ভোগ করছি আমরা।

ভাইয়া, একসময় কি যন্ত্রই সংগীত বানাবে?

সংগীত পুরোপুরি কৃত্রিম উপায়ে তৈরি সম্ভব কি না, এটা নৈতিক হবে কি না, সংগীত মানুষের মনকে (বা মন্ত্রিককে) ঠিক কীভাবে নাড়া দেয়, সংগীত ছাড়াই সংগীতের অনুভূতি দেওয়া সম্ভব কি না—এমন অজস্র কাজ আসলে চলছে। তুমি যদি ভালোবাসো গণিত আর সংগীত দুটোকেই, একদিন তুমিই হয়তো পৃথিবীকে জানিয়ে দেবে অমন অনেক প্রশ্নের উত্তর!

## অধ্যায় ৮

## ত্রিকোণমিতির কিছু কথা

৮.১

ভাইয়া, আপনি স্যারের সাথে দেখা করতে যাবেন না। আপনাকে অনেক অপমান করবে। অপমান শুনলে আপনার অনেক কষ্ট হবে। কষ্টে আপনি শহর ছেড়ে ঢাকায় চলে যাবেন। তখন আমাদের কী হবে ভাইয়া? সামনে টেস্ট পরীক্ষা। এত দিন পরে আপনাকে পেয়ে একটু একটু শিখতে পারছিলাম। আপনি না থাকলে আমি ফেল করব। বাবা মা ধরে গ্রামে বিয়ে ...।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, টিনা, অতদূর ভাবতে হবে না। তোমাকে কেউ বিয়ে দিয়ে দেবে না। আমার জন্য চিন্তা নিয়ে না। স্যার আমাকে অপমান করার সুযোগ পাবেন না।

৮.২

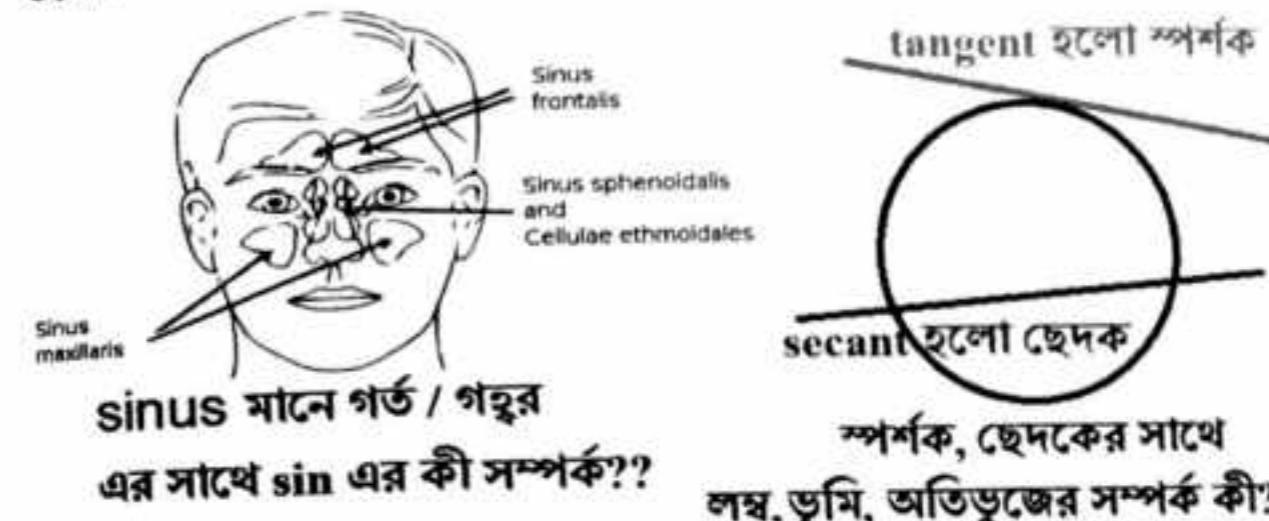
আজকে ত্রিকোণমিতি পড়ানো হবে শুনেই বান্টি হাত তুলল। তৃয হেসে বলল, এই চারজনের ক্লাসে হাত তোলার কী দরকার, সরাসরি প্রশ্ন করে ফেলো! ভাইয়া, আমার একটা প্রশ্ন মেলা দিন ধরে। sin, tan, sec— ত্রিকোণমিতির এই নামগুলো কোথেকে এল?

**সাইম, কল সামান্যে কোথেকে এল?**

তৃয জানে উত্তরটা। কদিন আগে একটা দারুণ বই পড়ছিলাম Great Moments in Mathematics before 1650। সেখানে খুব সুন্দর করে sin-এর গল্পটা বলা ছিল। উইকিপিডিয়া ঘুঁটে

আরও কিছু শিখেছিলাম। ভালোই হলো তোমরা জানতে চাওয়ায়। যা জেনেছি, তোমাদের সাথে ভাগ করে নিই। চলো আগে নামগুলোর আভিধানিক অর্থ জেনে নিই। এই আভিধানিক অর্থ আমি আগেও জানতাম, কিন্তু সেই জানাটাই আসলে আমাকে আরও দ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল!

sine (সংক্ষেপে আমরা লিখি sin) শব্দটা এসেছে লাতিন sinus থেকে, যার মানে হলো গর্ত বা গহুর! নাকের গহুরে প্রদাহ হলে তাকে sinusitis বলে, তখন প্রচণ্ড মাথাব্যথা হয়। তোমরা হয়তো তার কথা শুনেও থাকতে পারো।



tangent (যাকে সংক্ষেপে আমরা লিখি tan) মানে হলো স্পর্শক। তোমরা জানো কোনো একটা সরলরেখা যখন কোনো বৃত্তকে একটা মাত্র বিন্দুতে ছুঁয়ে যায়, সেই রেখাটিকে বলে স্পর্শক রেখা। tangent শব্দটা এসেছে লাতিন tangere থেকে যার মানে স্পর্শ করা।

secant শব্দটার অর্থ হলো ছেদক। একটা সরলরেখা যখন বৃত্তের একপাশ দিয়ে চুকে অন্যদিক দিয়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, অর্থাৎ দুটো বিন্দুকে ছেদ করে বেরিয়ে যায় তাকে বলে ওই বৃত্তের ছেদক। এই নামটা এসেছে লাতিন secare শব্দটি থেকে; যার মানে হলো কেটে ফেলা, ছেদ করা।

co-sine বা cos, co-tangent বা cot এবং co-secant বা cosec (একে সংক্ষেপে CSC-ও লেখা হয়)— এই নামগুলো আসলে sin, tan আর sec থেকেই এসেছে। cosine হলো sine-এর সাথি, cotangent

হলো tangent-এর সাথি এবং cosec হলো sec-এর সাথি। সাথি কী জিনিস সেটাতে একটু পরে আসছি। তার আগে নামগুলোর অর্থের দিকে আবার তাকাও।

স্পর্শক আর ছেদক নাহয় গণিতের ব্যাপার, এর সাথে tan আর sec কোনোভাবে মিলতেও পারে, কিন্তু গর্ত? এর সাথে sin-এর সম্পর্ক কী? মজার ব্যাপার হলো— সম্পর্ক আসলেই নেই। এটা একটা ভুল অনুবাদের ফসল!! একটা দারুণ ব্যাপার কী জানো, আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি তার সবকিছুই যে একেবারে সঠিক নিয়ম মেনেই এসেছে তা কিন্তু না। কিছু অভুত সুন্দর ‘ভুল’ হয় বলেই আমাদের পৃথিবীটা অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। যাহোক, এপর্যায়ে পুরোনো ব্যাপারগুলো আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। একটা সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলো থেকে দুটো দুটো করে নিয়ে মোট ছয় রকম অনুপাত পাওয়া সম্ভব। এই অনুপাতগুলোর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে—

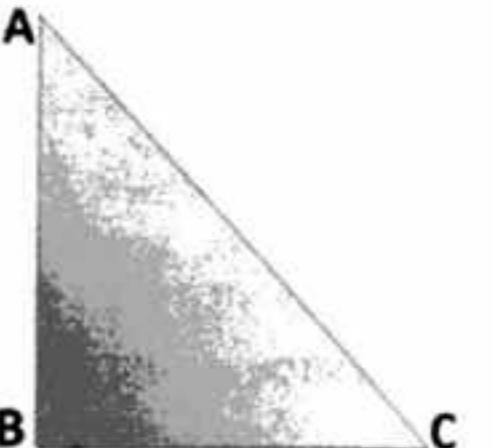
$$\sin\theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} \cos\theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} \tan\theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}$$

$$\cot\theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{লম্ব}} \sec\theta = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{ভূমি}} \csc\theta = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{লম্ব}}$$

অতিভুজ হলো সবচেয়ে বড় বাহুটা। যেমন ছবিতে AC হলো অতিভুজ। আচ্ছা বলো দেখি লম্ব আর ভূমি কোনটা হবে?

কেন ভাইয়া, BC হবে ভূমি আর AB হবে লম্ব!

উহ, এটা নাও হতে পারে! তোমার কোনো দোষ নেই। বাচ্চাদের অনেক সময়ই ঠিকমতো শেখানো হয় না। অনেকের মনেই ভুল ধারণা থাকে যে মাটি বরাবর অর্থাৎ অনুভূমিকভাবে যে বাহুটা শুয়ে আছে, সেটাই সব সময় ভূমি আর তার ওপর লম্বা যে দাঁড়িয়ে আছে, সেই হলো লম্ব। কিন্তু মূল ব্যাপারটা এমন না। আসলে অতিভুজকে বাদ দিলে অন্য দুটো বাহুর যেকোনো একটা লম্ব আর আরেকটাকে ভূমি ধরা যেতে পারে। তবে কোনটাকে আমরা ভূমি বলব, সেটা নির্ভর করবে কোন কোণটিকে নিয়ে আমরা কাজ করছি সেটার ওপর।



সমকোণ তো সব সময়ই সমকোণ—এটা নিয়ে এখানে আসলে ভাবার কিছু নেই। বাকি যে সূক্ষ্মকোণ দুটো রইল তাদের নিয়েই আমাদের যত চিন্তা। এখানে  $\angle BAC$  এবং  $\angle BCA$  হলো এমন দুটো কোণ। প্রথমে আমরা  $\angle BAC$ -এর কথা চিন্তা করি। দেখো এ কোণটি AC এবং AB এই দুটো বাহু মিলে তৈরি। AC তো অতিভুজ। এখন এই  $\angle BAC$ -এর সাথে আর যে বাহুটি রয়েছে, সেটিই হবে ‘ভূমি’ অর্থাৎ এখানে AB হলো ভূমি। নিখুঁত করে বললে বলা যায় ভূমি হলো ‘কোণ সংলগ্ন AB হলো ভূমি’। এ ক্ষেত্রে লম্ব হবে BC (আর কে হবে বলো, আর কেউ কি বাহু’। এ ক্ষেত্রে লম্ব হবে BC (আর কে হবে বলো, আর কেউ কি বাহু’। তাহলে বাকি আছে??)। লম্বকে তাই বলা যায় ‘কোণের বিপরীত বাহু’। তাহলে  $\sin BAC = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{BC}{AC}$ । একইভাবে  $\cos BAC = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{AB}{AC}$

এখন যদি আমরা অন্য কোণটি অর্থাৎ  $\angle BCA$ -এর কথা ভাবি, তখন আমরা দেখব ভূমি হয়ে গেছে BC এবং লম্ব হয়ে গেছে এর বিপরীত বাহু AB। এবার  $\sin BCA = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} = \frac{AB}{BC}$ । এবং  $\cos BCA = \frac{\text{ভূমি}}{\text{লম্ব}} = \frac{BC}{AB}$ ।

এবারে লক্ষ করো,  $\cos BAC$ -এর মান যা,  $\sin BCA$ -এর মানও তা। একই তা। আবার  $\sin BAC$ -এর মান যা,  $\cos BCA$ -এর মানও তা। একই সমকোণী ত্রিভুজে থাকা এমন সূক্ষ্মকোণ দুটোকে বলে পরম্পরের পূরক কোণ (complementary angle)। এমন একটা কোণের সাইন অন্য কোণের কোসাইনের সমান। সাথি অর্থাৎ CO ব্যাপারটা আসলে এখান থেকেই এসেছে। সুতরাং অনুমান করতে পারো এভাবে একটা কোণের সেক্যান্ট হবে অন্য কোণটির কোসেক্যান্টের সমান এবং একটা কোণের ট্যানজেন্ট হবে অন্য কোণটির কোট্যানজেন্টের সমান।

আবার ফিরে যাই মূল প্রসঙ্গে— সাইন যদি লম্ব আর অতিভুজের অনুপাত হয়, সেখানে গর্ত কোথেকে এল? সেক্যান্ট মানে যদি ছেদকই হবে তার সাথে অতিভুজ আর ভূমির অনুপাতের সম্পর্ক কী? ট্যানজেন্ট দিয়ে বোঝায় লম্ব আর ভূমির অনুপাত, তার সাথে স্পর্শকের সম্পর্ক কোথায়?

এই চিন্তাগুলোর জন্ম হয়েছিল গ্রিসে আর আদরে আদরে বেড়ে উঠেছিল আমাদের এই উপমহাদেশে। এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে

গেছে এ বিষয়গুলোর কথা। তার ধারণা বুঝতে গেলে আমাদের এমন একটা বৃত্তের দিকে তাকাতে হবে, যার ব্যাসার্ধ = ১ একক। ইবিতে আমরা এমন একটা বৃত্ত এংকেছি। এখানে  $OB=OD=\text{বৃত্তের ব্যাসার্ধ}=1$  একক।  $AB$  হলো  $BB'$ , জ্যা-এর অর্ধেক। একে বলা হয় অর্ধ-জ্যা।  $CC'$ , এই বৃত্তের একটা ছেদক। এর একটা অংশ হলো  $OC$ । এখানে ছেদক বা ছেদকের দৈর্ঘ্য বলতে আমরা  $OC$  অংশটুকুকেই বুঝব। আর স্পর্শক বলতে বুঝব  $CD$ । এবারে আমরা পুরোনো সংজ্ঞাগুলোর দিকে আবার তাকাব। কোণ  $COD$ -কে আমরা  $\theta$  নাম দিলাম। তাহলে  $\Delta COD$  থেকে আমরা দেখি—

$$\sec \theta = \sec COD = \frac{\text{অতিকৃত}}{\text{ভূমি}} = \frac{OC}{OD} = \frac{\text{ছেদক}}{\text{ব্যাসার্ধ}} = \frac{1}{1} = \text{ছেদক}$$

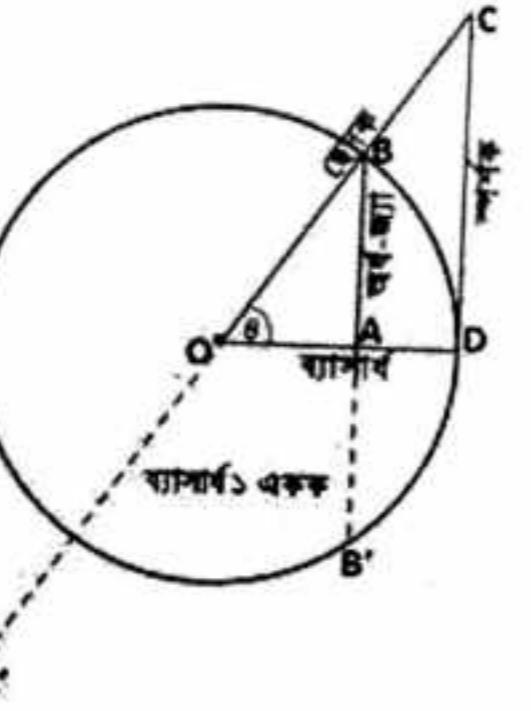
যাক বাবা, এতক্ষণ পরে আমরা দেখাতে পেরেছি, সেক্যান্ট আসলেই ছেদকের মান বের করে। এখন tangent-ও আমাদের হতাশ করবে না!

$$\tan \theta = \tan COD = \frac{\text{পর্যবেক্ষণ}}{\text{ভূমি}} = \frac{CD}{OD} = \frac{\text{স্পর্শক}}{\text{ব্যাসার্ধ}} = \frac{1}{1} = \text{স্পর্শক}$$

আর বাকি রইল  $\sin$ । সাইনকে আর্ভেট আসলে অর্ধ-জ্যা বলে ডাকতেন। কেন্দ্রে বিভিন্ন রকম কোণের জন্য অর্ধ-জ্যা-এর মান কেমন হবে তার একটা বিশাল লিস্টি তিনি বানিয়েছিলেন। যাহোক,  $\Delta BOA$  থেকে আমরা  $\sin \theta$ -এর মান বের করি।

$$\sin \theta = \sin BOA = \frac{\text{পর্যবেক্ষণ}}{\text{অতিকৃত}} = \frac{\text{অর্ধ-জ্যা}}{\text{ব্যাসার্ধ}} = \text{অর্ধ-জ্যা}$$

$\sin$  যে অর্ধ-জ্যাকে প্রকাশ করে এটা জেনেও আসলে স্বস্তি হয় না। অর্ধ-জ্যা-এর সাথে 'গর্ত' ব্যাপারটা কীভাবে মিলল? এখানে আসলে



অনুবাদকদের কারসাজি। আর্ভেট অর্ধ-জ্যাকে কখনো কখনো 'জ্যা-অর্ধ' আবার কখনো কখনো শুধু 'জ্যা' লিখতেন। আরব অনুবাদকেরা ভারতবর্ষের গণিতের কাজগুলো যখন সংস্কৃত থেকে আরবিতে অনুবাদ করছিলেন, তারা দেখলেন আরবিতে 'জ্যা'-এর কোনো প্রতিশব্দ নেই। তারা উচ্চারণের সাথে মিল রেখে এটার নাম দিলেন 'যিবা' (জ্যা → যিয়া → যিবা)। তোমরা হয়তো জানতেও পারো, আরবিতে যখন মানুষ লেখে, অনেক সময়ই তারা আকার-ওকার না দিয়ে অর্থাৎ যের, যবর, পেশ ব্যবহার না করেই লিখে ফেলে। ফলে তারা লিখল 'য ব'। পরবর্তী প্রজন্মের লেখকেরা যখন এই 'য ব' শব্দটা দেখলেন, তারা আর বুঝতে পারলেন না যে এটা হলো 'যিবা'। তারা দেখলেন য আর ব-এর সাথে আকার-ইকার বসিয়ে সুন্দর একটা আরবি শব্দ হয় 'যাইব', যার মানে হলো খাদ বা গর্ত। এরপর লাতিন ভাষার অনুবাদকেরা যখন অনুবাদ করলেন, তারা লাতিন ভাষায় গর্তের প্রতিশব্দ হিসেবে এর নাম রাখলেন sinus, তার থেকেই পরবর্তীতে এল sinc. এভাবেই আর্ভেটের সেই অর্ধ-জ্যা অর্ধদুনিয়া ঘুরে হয়ে গেল গর্ত!

পৃথী মাথা নাড়ল, কী অভূত, কী অভূত! নামটা কোথেকে এল না জেনেই কত সব সমস্যা সমাধান করে ফেললাম!

টিনা বলল, ভাইয়া, ত্রিকোণমিতির এই যে বিশাল বিশাল সমস্যার ত্রিকোণমিতি কোন কাজে লাগে? সমাধান করি আমরা। এগুলো আসলে বাস্তবে কী কাজে লাগে? আমাদের প্রথাগত পড়াশোনায় তো আর এ প্রশ্ন করা যায় না, করলে উত্তর আসে— নম্বর পাবা তাই। যদি উত্তরগুলো জানতে পারতাম, একটু হলেও কষ্ট ঘুচত।

আমরা যখন ফোনে কথা বলছি, এগুলো শব্দতরঙ্গ থেকে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ হয়ে যায়। অল্ল ফ্রিকুয়েন্সির সেই তরঙ্গকে হাই ফ্রিকুয়েন্সির ক্যারিয়ার তরঙ্গের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তরঙ্গের এসব হিসাব করা হয়  $\sin \theta$ ,  $\cos \theta$  এসব ব্যবহার করে। এদের নিয়ে হিসাব করা অনেক সহজ। তাই যেসব সিগনাল দেখতে সাইন কস-এর মতো না, তাদেরও সাইন কস বানিয়ে ফেলা হয়। সেটার নিয়মটা বের করেছিলেন

গণিতবিদ জোসেফ ফুরিয়ার। মোবাইল ফোনের যে ডিসপ্লে তোমরা অহরহ দেখো, শুধু সেটা সম্পর্কে জানতে গেলেও তুমি আবাক হয়ে যাবে। কোথায় অঙ্করগুলো দেখা যাবে, তার জন্য লাগবে ত্রিকোণমিতি এবং জ্যামিতি।

ধন্যবাদ ভাইয়া, এখন মনে হচ্ছে ত্রিকোণমিতি আসলেই কাজে লাগে। আমাদের বইয়ে অবশ্য ভবনের উচ্চতা নির্ণয়ের ব্যবহার নিয়ে অঙ্ক আছে। সেই অঙ্কটা করতে গিয়ে সেদিন একটা প্রশ্ন মাথায় এসেছিল,  $\sin A = \sin 30^\circ$  হলে কেন  $A=30^\circ$  লেখা হয়, এখানে = চিহ্নের উভয় দিক হতে  $\sin$  কাটা যায়, নাকি **সাইন আর সাইন কি কাটাকাটি যায়?** অন্য কিছু, এর সঠিক ব্যাখ্যা কী?

তৃৰ্য বলল, না, এটা আসলে কাটা যায় না।  $30^\circ$  হলো একটা সমাধান, তবে সত্যি হলো এ ক্ষেত্রে  $A$ -এর অসীম সংখ্যক সমাধান রয়েছে। তাদের সাধারণভাবে  $A = 180n + (-1)^n \cdot 30$  আকারে লেখা যায়, যেখানে  $n$  পূর্ণসংখ্যা। যদি বলে দেওয়া থাকে বা জানা থাকে  $A$  একটা সূক্ষ্মকোণ, শুধু তাহলেই বলা যায়  $A=30^\circ$ ।

আরেকটু বুঝিয়ে বলবেন?

ব্যাপারটা সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে পারি। দেখো,  $\sin 30^\circ$ -এর মান হলো  $\frac{1}{2}$ । তাহলে সমীকরণটাকে ভাবা যায়  $\sin A = \frac{1}{2}$ । চতুর্ভাগের হিসাব তো তোমরা জানো, সেখান থেকে বলা যায়  $\sin 30^\circ$  ও যা,  $\sin 150^\circ$ -এর মানও তাই। আবার  $\sin 390^\circ$ -এর মানও তাই, এরপর  $\sin 510^\circ$ -এর মানও একই। ভালো করে দেখো

$$\sin 30^\circ = \sin 150^\circ = \sin 390^\circ = \sin 510^\circ = \dots$$

এখান থেকে তাকালে  $A$ -এর মান  $30^\circ, 150^\circ, 390^\circ, 510^\circ$  সবাই হতে পারে। এবার যদি খেয়াল করো  $180$  ডিগ্রির গুণিতকগুলো থেকে এই কোণগুলো কত দূরে, দেখবে ওপরের লাইনটাকে এভাবে লেখা যায়—

$$\sin(180 \times 0 + 30) = \sin(180 \times 1 - 30)$$

$$= \sin(180 \times 2 + 30) = \sin(180 \times 3 - 30)$$

$180$ -এর জোড় গুণিতক হলে তার পাশে বসছে প্লাস চিহ্ন, আর বিজোড় গুণিতক হলে মাইনাস চিহ্ন। এটাকেই  $180n + (-1)^n \cdot 30$  আকারে লেখা হয়।  $(-1)^n$  এর কাজই হলো চিহ্ন পরিবর্তন করা। জোড় হলে ধনাত্মক, বিজোড় হলে ঋণাত্মক। এখান থেকে সাধারণ সমাধান এভাবে ভাবা হয়—  $\sin A = \sin \theta$  হলে,  $A = n\pi + (-1)^n \theta$ , এবার রেডিয়ানে লিখলাম। এটাই বেশি প্রচলিত।

ভাইয়া, এ তো শুধু সাইনের ব্যাপার। আর  $\cos, \tan$  এদের ক্ষেত্রে?

$$\cos A = \cos \theta \text{ হলে, } A = 2n\pi \pm \theta$$

$$\tan A = \tan \theta \text{ হলে, } A = n\pi \pm \theta$$

তবী জিজ্ঞেস করে, ভাইয়া, আমরা তো  $\sin 30$ -এর মান জানি। এভাবে  $45, 60, 90,$

**sin 13°, sin 71°** এমন যেকোনো কোণের মান কীভাবে পাওয়া যাবে?

০ এদের মান জানি। কিন্তু যেকোনো কোণ যেমন  $51^\circ, 13^\circ, 11^\circ, 71^\circ$  এমন হাবিজাবি কোণগুলোর  $\sin, \cos$ -এর মান বের করার আসল পদ্ধতি কী? যারা বের করেছে, কীভাবে করেছে?

তৃৰ্য বলল, যেকোনো পূর্ণসংখ্যার কোণের জন্য সাইন কস-এর মান বীজগণিত আর জ্যামিতি দিয়ে বের করা যায়। তুমি যদি ১ ডিগ্রির জন্য এদের মান বের করতে পারো, তাহলে যেকোনো ডিগ্রির জন্য মান পাবে,  $\sin(A+B), \sin(A-B)$  এমন সূত্রগুলো ব্যবহার করে। ১ ডিগ্রির মান বের করা খুব সহজ না। তবে করা যায়।

৪৫ আর  $30$  ডিগ্রির জন্য তো জানই, সমকোণী ত্রিভুজ থেকে মান পাওয়া যায়। সেখান থেকে  $\sin(A-B)$  থেকে পাওয়া যায়  $15$  ডিগ্রির জন্য মান।  $18$  ডিগ্রির জন্য। পঞ্চতুজ থেকে পাওয়া যায়  $3$  ডিগ্রির জন্য। সেখান থেকে আর  $15$  পাওয়া গেলে পাওয়া যায়  $3$  ডিগ্রির জন্য। সেখান থেকে  $\sin 3A$ -এর সূত্র থেকে ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধান করে পাওয়া যায়  $\sin 1^\circ \sin$  পেলে তো  $\cos$  পাওয়াই যায়  $\sqrt{1 - \sin^2 \theta}$  থেকে।

<sup>১</sup> আরও জানতে চাইলে এই লিঙ্ক থেকে হিসেবটা দেখতে পারেন—  
<http://www.efnet-math.org/Meta/sine1.htm>

আর এমনিতে দুইটা সহজ অসীম ধারা আছে, যেগুলো দিয়ে যেকোনো রেডিয়ান কোণের জন্য এদের মান মোটামুটি নিখুঁতভাবে অনুমান করা যায়।  $x$  রেডিয়ান হলে,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

তোমরা যখন একটু বড় হবে, ক্যালকুলাস শিখবে। সেখানে ম্যাকলরিনের ধারা বলে একটা ব্যাপার আছে, ওখান থেকে এই ধারাগুলোর প্রমাণ জানতে পারবে। এটুকু বলে অঙ্ক ভাইয়া একটু থামল। তারপর বলল, এই ধারা দুটো দেখে তোমাদের আরেকটা জিনিস বলতে ইচ্ছা করছে,

**কাল্পনিক সংখ্যা কী?** হয়তো তোমরা এখনই বুঝবে না। তোমরা কি কাল্পনিক সংখ্যা বা জটিল সংখ্যার নাম শুনেছ?

তৃর্য ভেবেছিল কেউ শোনেনি, কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে পৃথী বলল, ভাইয়া, ঝণাঞ্চক সংখ্যার বর্গমূলগুলো কাল্পনিক, তাই না?

বাহ, তুমি জানো দেখি! হ্যাঁ, ঝণাঞ্চক সংখ্যার বর্গমূলকে বাস্তব জগতে দেখা যায় না, কিন্তু গণিতের অনেক অসাধারণ কাজ এরা করে ফেলে। এদের সরদার হলো  $-1$ -এর বর্গমূল, যাকে imaginary শব্দের প্রথম অঙ্কের  $i$  দিয়ে প্রকাশ করা হয়।  $i = \sqrt{-1} \therefore i^2 = -1$ । যে জন্য এটুকু বলা, একটু আগের যে ধারা দুটো দেখলে, এদের ব্যবহার করে একটা অসাধারণ সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছিলেন মহান গণিতবিদ অয়লার। তোমরা তো স্বাভাবিক লগারিদমের ভিত্তি  $e$ -এর নাম শুনেছ। সেটাৱ একটা ধারা আছে,

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \dots$$

এটা দেখো, আর ওপরের দুইটা দেখো, মনে হয় যেন ওপরের দুটো মিলিয়েই এটা তৈরি। শুধু প্লাস-মাইনাসে ঝামেলা আছে। অয়লার  $i$  ব্যবহার করে দেখালেন,

$$e^{ix} = 1 + \frac{ix}{1!} + \frac{i^2 x^2}{2!} + \frac{i^3 x^3}{3!} + \frac{i^4 x^4}{4!} + \frac{i^5 x^5}{5!} + \frac{i^6 x^6}{6!} + \dots$$

$$\therefore e^{ix} = 1 + \frac{ix}{1!} - \frac{x^2}{2!} - \frac{ix^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{ix^5}{5!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

এখানে আমি মাঝেমধ্যে  $i^2 = -1$  ব্যবহার করেছি। এটাকে সাজিয়ে অয়লার লিখলেন,

$$e^{ix} = (1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots) + i(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots)$$

বা,  $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ , এটা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সম্পর্কগুলোর একটা। এখানে  $x$ -এর মান  $\pi$  রেডিয়ান বসালে একটা দারুণ ব্যাপার ঘটে। পাই রেডিয়ান হলো  $180$  ডিগ্রি।  $\cos 180$  ডিগ্রির মান হলো  $-1$  আর  $\sin 180$  ডিগ্রি শূন্য। এগুলো বসিয়ে পক্ষান্তর করলে যেটা পাওয়া যায়, তাকে বলে পৃথিবীর সুন্দরতম সমীকরণ। সংবাদমাধ্যমে, মানুষের ভোটাভুটিতে, সমীকরণের গণিতের সুন্দরতম সমীকরণ

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সমীকরণটার দিকে। পুরো প্রতিপাদনটা বোঝেনি। কিন্তু ওরা দেখল একটামাত্র সমীকরণ, তার মাঝে কত অসাধারণ সব ব্যাপার— সংখ্যাদের ভেতর যারা রঞ্চি-মহারঞ্চি সেই  $e$ ,  $i$ ,  $\pi$ ,  $1$ ,  $0$ -কে নেই?

কিন্তু এর ভেতরে কি কোনো গৃঢ় অর্থ আছে? অঙ্ক ভাইয়া বলল, অবশ্যই আছে, তবে সেটা বুঝতে তোমাদের আরেকটু বড় হওয়ার যখন এই সমীকরণের

ওরা অপেক্ষা করতে লাগল আরেকটু বড় হওয়ার যখন এই সমীকরণের অর্থ বুঝে ফেলা যাবে।

---

\* <http://www.bbc.com/earth/story/20160120-the-most-beautiful-equation-is-eulers-identity>

রইল, মাথা নিচু। গতকাল সন্ধ্যায় নজিবুল্লাহ সারের কয়েকটা গোপন  
কাহিনি শুনেছে সে, এক বন্দুর কাছ থেকে। তখনই সিঙ্কান্ত নিয়েছে,  
সারের কোনো কথার জবাব সে দেবে না। স্যার তৃষ্ণকে চুপ দেখে গলা  
আরেকটু চড়ান। তুমি অলিম্পিয়াড করে বেড়াও, সারা দেশে জ্ঞান দাও,  
ভালো কথা— আমার স্কুলের কাউকে তোমার জ্ঞান দেওয়ার দরকার  
নাই।

তৃষ্ণ বলতে পারত, সে তো সেধে জ্ঞান দিতে চায় নাই, ওদের মায়েরাই  
তৃষ্ণের মাকে বলেছিলেন আর সেটাও বলেছিলেন আপনার কারণে।  
তৃষ্ণ তবু কিছু বলে না। নজিবুল্লাহ সাহেবের গলা আরও চড়তে থাকে।  
তৃষ্ণের কানে কিছুই প্রবেশ করে করে, সে অবাক দৃষ্টিতে স্যারের দিকে  
তাকিয়ে থাকে, বোঝার চেষ্টা করে একটা মানুষকে। বেশ খানিকক্ষণ  
পর স্যারও ক্লান্ত হয়ে আসেন, কী হলো, জবাব দিছ না কেন? খুব  
নাকি স্মার্ট তুমি, বিতর্কও করে বেড়াও শুনলাম। বলো, উল্টাপাল্টা  
জিনিসপাতি শিখায়ে কী লাভ, যুক্তি দাও। এরপর তৃষ্ণ যেটা করল সেটা  
কেউই কল্পনা করেনি।

তৃষ্ণ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়, হাতজোড় করে, নতমুখে স্যারকে বলে,  
স্যার, আমি আজকে আসলে বিতর্ক করতে আসি নাই। আমি আপনার  
কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। নজিবুল্লাহ সাহেবকে হতভম্ব দেখায়।

আপনার ছাত্রছাত্রী, সবার কাছে শুধু শুনেছি আপনি কত ভয়ংকর।  
আপনার যত গল্প শুনেছি সবগুলোতে আপনাকে বলা হয়েছে নিষ্ঠুর।  
সেই গল্প শুনতে শুনতে মনে হয়েছে— কী খারাপ একজন মানুষ  
আপনি। একদিন আগেও ভেবেছি আপনাকে কত কথা শুনিয়ে দেব।  
কিন্তু কালকে যখন আপনার কথা শুনলাম... স্যার আমাকে মাফ করে  
দেবেন, আমি আপনাকে চিনতে পারি নাই। তৃষ্ণ কী শুনেছে নজিবুল্লাহ  
বুঝতে পারেন না। তার হতভম্ব ভাবটা কাটে না। তৃষ্ণ নিজেকে সংবরণ  
করে বলে—

আমি আপনার স্কুলে পড়ি নাই, স্যার। আমি ছিলাম জিলা স্কুলে।  
তিনি বছর আগের একটা ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমার বন্ধু  
ইমন পড়ত আপনার স্কুলে। খুব গরিব ছিল ওরা, অভিবী সংসারের

## অধ্যায় ৯

# মুখোমুখি অঙ্ক ভাইয়া আর নজিবুল্লাহ মাস্টার

৯.১

হ্যাঁ, ভেতরে আসো। দরজাটা ভিড়ায়ে দাও। বসো। কী নাম যেন?  
তৃষ্ণ?

জি স্যার।

হ্ম। বুঝেটে পড়ো, বিরাট ভাব, না? গণিত অলিম্পিয়াড করে বেড়াও।  
অঙ্কের নাকি জাহাজ। ছেলেপেলেদের উল্টাপাল্টা প্রশ্নের উত্তর দাও।  
ভালো, খুব ভালো! এই ছেলে, তুমি যে চারটা ছেলেমেয়ের জীবন  
নষ্ট করে দিচ্ছ, সেটা টের পাও? অ্যাই দরজার বাইরে কে রে? অ্যাই!  
বাইরে বান্টিরা চারজন চুপিচুপি দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা  
করছিল। স্যার টের পেয়েছে বুঝতেই ভয়ে দৌড় দিল ওরা। নজিবুল্লাহ  
সাহেব আবার ফেরেন তৃষ্ণের দিকে,

আজ বাদে কাল টেস্ট পরীক্ষা বাচ্চাগুলার। ওদের শেখা দরকার কীভাবে  
অঙ্কগুলো খাতায় লিখবে। আর এখন তুমি শেখাচ্ছ কোনটা কী কাজে  
লাগে, কী কোথেকে এল— এই সব আবোলতাবোল। এসব শিখিয়ে  
লাভ আছে? তৃষ্ণ যেহেতু সরাসরি ছাত্র না, রাগটা যতটা পারা যায়  
নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন নজিবুল্লাহ।

একদিন আগেও তৃষ্ণ ভেবেছিল, স্যারকে অনেকগুলো কথা শুনিয়ে  
দেবে, জ্ঞান দেবে। এখন স্যারের সামনে পড়ে সে একেবারে চুপ করে

পড়ে, আমরা বন্ধুরা অনেক জায়গায় হাত পেতেছি। অনেক নামীদামি লোক আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। কুড়িয়ে কাড়িয়ে যা পেলাম, তাতে হিসাব করে দেখলাম বাইরে নিয়ে যেতে আরও অন্তত বিশ হাজার টাকা লাগে। আমরা বন্ধুরা ওই দিন অনেক কেঁদেছিলাম, প্রিয় বন্ধুকে সাহায্য করতে না পারার কষ্টে। পরদিন খবর পাই, ইমনের বাবার অ্যাকাউন্টে কে যেন বিশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। খোঁজ করেও পাইনি, জন্য। আমরা অনেক দোয়া করেছিলাম পরিচয় না জানা মানুষটার প্রতিবছর অন্তত চারজন ছাত্রাত্ত্বীর রেজিস্ট্রেশনের টাকা শত্রু দিয়ে দেয়, সেটা শত্রুকে দেন আপনি। রেজিস্ট্রেশনের টাকা নাই বলে পরীক্ষা দিতে পারেনি, এ ঘটনা কোনো দিন আপনার স্কুলে হয়নি। শত্রু বলেছে, বৃষ্টি হলে স্কুলের একটা ঘরে ছাদ দিয়ে পানি পড়ত, সেটা আপনি নিজের টাকায় মেরামত করেছেন অন্য লোকের নাম দিয়ে। কেউ ধারণা করেনি, এটা আপনার কাজ হতে পারে।

এসব কথা কে বলল তোকে? দ্রুত রাগ পড়ে যায় স্যারের। শান্তগলায় তুমি থেকে তুইয়ে নেমে আসেন। এই ‘তুই’ তাচ্ছিল্যের না, মমতার।

স্যার, শত্রু আমাকে বারবার বলেছে, আপনি ওকে বলতে নিষেধ করেছেন। কালকে আড়তায় আমি আপনাকে নিয়ে অনেক খারাপ খারাপ কথা বলছিলাম, আপনাকে আজ কী কী কথা শোনাব সেসবের বয়ান দিচ্ছিলাম। সবাই আমাকে আরও উসকে দিচ্ছিল, কেবল শত্রু ছাড়া। ও চুপ করে ছিল। তারপর আমি যখন ফিরে আসছিলাম, ও ডাক দিয়ে আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল। আমি জানতাম না, শত্রু আপনার ডান হাত, আপনার সব সাহায্য ও-ই চরম গোপনীয়তায় সবার কাছে পৌছে দেয়। আপনাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে ও। আমাকেও খুব পছন্দ করে। আমার কাছ থেকে আপনার নামে এসব কথা শুনে ও আর চুপ থাকতে পারেনি। খুব মন খারাপ করেছিল। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সব বলে দিয়েছিল।

সব শুনে আমার মনে আর কোনো যুক্তি কাজ করে নাই। নিজেকে

অপরাধী মনে হয়েছে। ওপর থেকে একটা মানুষকে কত কিছুই না ভাবা যায়। স্যার, আমাকে শ্রমা করবেন, আপনার মতো একজন মানুষকে নিয়ে কত খারাপ কথা আমি বলেছি! যে মানুষটা ছাত্রাত্ত্বীদের জন্য নিয়ে করেন, ওদের নিয়ে থাকার জন্য যে মানুষটা বিয়েটাও করেননি, এত করেন, দিনের নিয়ে থাকার জন্য যে মানুষটা অডিটের সময় স্কুলের নাম যেন খারাপ না হয়, তার জন্য যে মানুষটা অডিটের সময় স্কুলের নাম যেন খারাপ না হয়, তার জন্য যে মানুষটা দিনের পর দিন স্কুলেই থেকেছেন, এত ভালো যার অনার্সের রেজাল্ট, যে চাইলেই নামকরা কোম্পানির সিইও হতে পারত, যে মানুষটা তার ছাত্রাত্ত্বীদের কথা ভেবে জীবন পার করে দিয়েছেন এই মফস্বলের স্কুলে— আমি তাকে নিয়ে কী সব কথা বলেছি, তারই আদরের ছাত্রাত্ত্বীদের কাছে! বলে তৃৰ্য মুখ নিচু করে ফেলে, ওর গলা ধরে আসে অপরাধবোধে।

পাহাড়ের মতো কঠিন মানুষ বরনার মতো তরল হয়ে গলে পড়েন এবার। উঠে এসে তৃৰ্যের মাথায় হাত রাখেন। বাবারে, আমার এই এত বছরের জীবনে কেউ কোনো দিন এভাবে বলে নাই। জীবনের সবই তো এই বান্দরগুলাকে মানুষ করতে দিয়ে দিলাম। অথচ ওরা আমারে কী ভয় পায়, ঘেন্না করে। আমারও তখন জিদ লাগে আরও। মনে হয়, ভয় যখন পাসই, ভয়ের চূড়ান্তটাই আমি দেখাব। তাই বলে ওদের কোনো দিন খারাপ চাই নাই, বাবা। ওদের রেজাল্ট দেখ, সব কয়টা গণিতে এ প্লাস পায়। আমি জানি ওরা কোনো রকম দুর্নীতি না করেই এ প্লাস পায়। ওদের জন্য কত করি, ওরা ওই সব কোনো দিনো বুঝবে না। আমিও ধার ধারি না, কে কী বলল তার, ওরা জীবনে ভালো করলেই আমি খুশি!

তৃৰ্য এবার বলে, স্যার, আমার অনেক হিসাব মেলে না। আপনার মতো মানুষ একটা ছেলেকে একটা প্রশ্নের জন্য ফেল করিয়ে দেবে কেন?

স্যার হাসেন, সবাই এটাই বলে, না? শোন, দুনিয়ার কোনো শিক্ষক প্রশ্ন করার জন্য কাউকে ফেল করায় না। বাণ্টির কথা বলিস তো? ওই বজ্জাতটা আমার অনেক আদরের। কী করব, আদরটা দেখাতে পারি না, মানুষটাই হয়ে গেছি এমন। শাস্তি দিয়ে আদর বোঝাই। ছেলেটার অক্ষের মাথা অনেক ভালো। কিন্তু বাপ-মা তো খবর রাখে

না— বান্দরটা কয়েক মাস ধরে শহরের সবচেয়ে খারাপ ছেলেগুলোর সাথে মিশছিল। এক-দুইবার একসাথে গাঁজার আড়তাতেও গেছে শুনেছি। ওকে একটা ধাক্কা দেওয়া খুব দরকার ছিল। চাইলে টেনেটুনে পাস করাতে পারতাম। কিন্তু তাহলে ও মনে করত, পাস তো করেই যাচ্ছি। ও কিন্তু খালি আমার বিষয়েই না, অন্য বিষয়গুলোতেও খারাপ করেছে। অথচ ওর মতো ছেলের কত ভালো রেজাল্ট করা উচিত। দরজার বাইরে একটা ফৌপানো কানার আওয়াজ পাওয়া যায়, অন্যান্য এলেও বান্টি আবার লুকিয়ে আড়ি পেতেছিল বাইরে, শুনতে চেয়েছিল ওদের কথোপকথন। স্যার ওকে এত ভালোবাসেন ব্যাপারটা ও কল্পনাও করতে পারেনি, নিতে পারেনি। দরজার বাইরে আওয়াজ শুনে আবার হাঁক দেন নজিবুল্লাহ, অ্যাই, দরজায় কে রে? বান্টি চোখ মুছতে মুছতে সরে যায়।

অঙ্ক ভাইয়ার হিসাব মেলে এইবার। নিজেকে সামলে নিয়ে হাতজোড় রেখেই সে নজিবুল্লাহকে বলে, স্যার, আমার একটা আর্জি আছে আপনার কাছে, আপনি না করতে পারবেন না।

জোর করে এই ভয়টা আর কুড়াবেন না। ওরা আপনাকে অপছন্দ করে আপনি প্রশ্ন করতে দেন না বলে। আমার আর্জি, ওরা যদি কোনো প্রশ্ন করে— স্যার, পিংজ, চেষ্টা করবেন শুনতে। আমি বান্টিদের বলেছি, একটা প্রশ্ন মেরে ফেলা মানে ভবিষ্যতের একজন চিন্তাশীল মানুষকে ধ্বংস করে দেওয়া, এটা আমি মন থেকে বিশ্বাস করি বলেই বলেছি। আপনি এটা করবেন না স্যার। আমি জানি, আপনি ওদের ভালো রেজাল্ট নিয়ে খুব চিন্তা করেন। আপনি যদি ওদের কৌতুহলটাকে জাগিয়ে রাখেন, ওরা অনেক বড় মানুষ হবে, স্যার। আপনি তো এটাই চান, না?

এ কথাগুলো বিতর্কের সুরে বললে নজিবুল্লাহ স্যার হয়তো ম্রেফ উড়িয়েই দিতেন ধর্মক দিয়ে, কিন্তু সময়ের আর পরিবেশের একটা বিরাট ক্ষমতা আছে, মানুষের মনোজগৎকে প্রভাবিত করার। এই মুহূর্তে নজিবুল্লাহ সাহেবের মনে হয়, তৃৰ্য ঠিকই বলেছে। এই ভয় কুড়ানোর কোনো মানে হয় না!

বিদায় নেওয়ার সময় তৃৰ্যকে জড়িয়ে ধরেন তিনি— বাবারে, তোর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলাম আমি আজ। তুই ভালো থাকিস, কখনো কিছু লাগলে জানাস।

## ১.২

এরপর থেকে নজিবুল্লাহ মাস্টার আর কোনো দিন কাউকে প্রশ্ন করার সময় থামাননি। চেষ্টা করেছেন যথাসাধ্য উভর দেওয়ার, ওদের আগ্রহটা জাগিয়ে রাখার। দুই বছর পরে যখন জেলার সেরা শিক্ষকের পুরস্কার ঘোষণা করা হলো, তার নামটা দেখে অবাক হয়নি কেউ। ছাত্রছাত্রীরা তাকে নিয়ে মিছিল বের করতে চেয়েছিল, তিনি কষ্টে থামিয়েছেন ওদের পাগলামি। টিনা, তন্মী তখন কলেজে। ওরাও খুব খুশি হয়েছিল, স্যারের সংবাদ পেয়ে। স্যারের অমন বদলে যাওয়ায় ওদেরও কোথায় যেন একটা ভূমিকা আছে। ওদের মনে পড়ে অঙ্ক ভাইয়ার কথা। ভাইয়ার আম্মা পরের বছর চাকরির প্রমোশন পেয়ে চলে যান অন্য একটা শহরের নামকরা কলেজে।

অঙ্ক ভাইয়ার অনেক বন্ধু এই শহরে, তাই ভাইয়া মাঝে দুইবার এসেছিলেন অল্প কয়েক দিনের জন্য। ওদের সাথে দেখা করেছেন প্রতিবারই। অনেক গল্প করেছেন ওদের সাথে। শেষবার যখন ওদের দেখা হয় টিনা জানতে চেয়েছিল, ভাইয়া, আপনি আসল অঙ্ক ছাড়াও তো অনেক কিছু জানেন। কোথেকে কী এল, কার নাম কীভাবে হলো— এগুলো কেন মনে রাখেন? এসব জেনে লাভ কী? গণিতকে কি অনেক ভালোবাসেন? উভরে ভাইয়া যা বলেছিল সেটা ওদের সব সময় মনে থাকবে—

এই প্রশ্নটার মুখোমুখি আমাকে প্রায়ই হতে হয়। এই যে এসব নামটাম কোথেকে এল, কে নাম দিল—এই সব জেনে লাভটা কী? তার চেয়ে শুধু এগুলো কীভাবে কাজ করে এইটা জানলেই কি হয় না? নাহ! চোখের দেখা দেখেই লাভ-ক্ষতির হিসাবটা আসলে করে ফেলা যায় না। যা কিছু শুধুই যুক্তির, শুধুই প্রয়োজনের, তা দিয়ে ভালোবাসা ব্যাপারটাকে বোঝা যায় না! যে মানুষটা শুধুই তার প্রয়োজনের সময় তোমাকে স্মরণ করে, সে তোমাকে ভালোবাসে কি না তুমি বুঝবে না!

ধরো তোমার পাশের বন্ধুটার সাথে তোমার এমন সম্পর্ক, তুই আমাকে  
এই নোটটা দিবি, আমি তোকে ওইটা দেব। এমন প্রয়োজনের সম্পর্ক  
থেকে তোমাদের বন্ধুত্ব কতখানি তীব্র, এটা বোৰা যাবে না। কিন্তু  
ধরো, একদিন বন্ধুটা চুপচাপ বসে আছে, তুমি পাশে গিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে  
জিজ্ঞেস করলে, তোর কি মন খারাপ? এই অপ্রয়োজনীয় কথাটুকুর  
মধ্যে অনেক বেশি গভীরতা আছে, ভালোবাসা আছে! এবং তুমি  
প্রায়ই দেখবে একটা তুচ্ছ অপ্রয়োজনীয় কথা কিংবা কাজ থেকে তৈরি  
হওয়া বন্ধুত্বটুকু, ভালোবাসাটুকু সারা জীবনে তোমাকে যা কিছু দেবে,  
হাজার হাজার প্রয়োজনীয় কথাও সেটা পারবে না! জ্ঞানের ব্যাপারটা ও  
ঠিক তাই। গণিতের একটা ছোট অপ্রয়োজনীয় গল্প তোমার মধ্যে  
যদি ভালোবাসার একটা একটা ছোট বীজ বুনে দেয়, সে যে একদিন  
মহিরুহ হয়ে উঠবে না, কে বলতে পারে! আমরা মানুষ— যুক্তি দিয়ে  
যা বুঝি তাকে যখন আবেগ দিয়ে অনুভব করি, সেই জ্ঞানটা আমাদের  
অনেক বেশি মানসিক শক্তি জোগায়, এগিয়ে নিয়ে যায় আরও অনেক  
অনেক দূর!

## পরিশিষ্ট ১

**হাতে-কলমে ঘনমূল নির্ণয় :** বর্গমূলের নিয়মটা কেন কাজ করে তার  
ব্যাখ্যা এবং সেখান থেকে ঘনমূল বা  $n$ -তম মূল বের করার পদ্ধতি  
তৈরি

এই লেখাটা আসলে অন্যদের জন্য যতখানি লেখা, তার থেকে বেশি  
নিজের জন্য— প্রায়ই ভুলে যাই কিনা! আমাদের সপ্তম শ্রেণির বইয়ে  
হাতে-কলমে বর্গমূল বের করার একটা নিয়ম দেওয়া ছিল। সেখান  
থেকে বর্গমূল বের করতে পারতাম, কিন্তু সত্যিকার অর্থে বুঝতাম না  
ব্যাপারটা কেন কাজ করে। এরপর ক্লাস নাইন-টেনে থাকতে ব্যাপারটা  
নিয়মটা কেন কাজ করে। চেষ্টা করে দেখি— ঘনমূল  
নিয়ে আবার আগ্রহ জন্মাল এবং ইচ্ছে হলো চেষ্টা করে দেখি— ঘনমূল  
বের করার কোনো নিয়ম বের করতে পারি কি না। চেষ্টায় হয়তো কোনো  
ক্রিটি ছিল, তাই তখন পারিনি। পরে বুয়েটে দ্বিতীয় বর্ষে থাকতে আবার  
যখন ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম, তখন বিষয়টা বেশ সহজ মনে হলো।  
ব্যাপারগুলো নিজে নিজে বের করেছিলাম, কিন্তু কোনোভাবেই দাবি  
করছি না যে এটা আমার আবিষ্কার। এখন ইন্টারনেটে ‘manually  
find cube root’ লিখে গুগল করলেই এই পদ্ধতির অনেক নজির  
পাওয়া যায়। তখন অনেক সময় নিয়ে বের করেছিলাম।

যাহোক, আমি এখানে চেষ্টা করব, যেকোনো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার  
বর্গমূল কীভাবে করতে হয়, সেই নিয়মটা শুরুতে বোঝাতে এবং  
তারপর সেখান থেকে ঘনমূলের নিয়ম বের করতে। এরপর আগ্রহীরা  
যেন  $n$ -তম মূল বের করতে পারে, তার কিছুটা নির্দেশনা দেওয়া হবে।

## বর্গমূলের নিয়ম এবং এর পেছনের ঘটনা

এককথায় আসল ব্যাপার হলো  $(10a+b)^2=100a^2+20ab+b^2$

একাধিক অঙ্কবিশিষ্ট যেকোনো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যাকে  $(10a+b)$  আকারে লেখা যায়। যেমন ২৩-কে লেখা যায়  $10 \times 2 + 3$ । আবার ১১৩-কে লেখা যায়  $10 \times 11 + 3$ । এটা মাথায় রেখে আমরা বর্গমূলের নিয়মটাতে মনোযোগ দিই।

ধরা যাক ১৬৯ সংখ্যাটার আমরা বর্গমূল বের করতে চাই।

১। প্রথমে ডান দিক থেকে শুরু করে দুটো দুটো করে ঘর নিয়ে গ্রুপ বানাই। প্রতিটা গ্রুপের ওপরে একটা দাগ দিয়ে চিহ্নিত করি। ৬৯ একটা গ্রুপ আর ১ একটা গ্রুপ। (দুটো বানানোর জন্য এটাকে ০১ ও ভাবতে পারো)। খেয়াল করো, গ্রুপটা শেষ থেকে শুরু করছি। ১৬ আর ৯, এমন করে গ্রুপ বানালে হবে না কিন্তু! ভাগ করার সময় যেমন একটা দাগ দেওয়া হয়, ডান দিকে অমন একটা দাগ দিলাম। দাগের ডান পাশে

**বর্গমূলের জায়গা**

১ ৬৯ |

ভাগের বেলায় যেখানে ভাগফল থাকত, সেখানে এখন আমরা আমাদের বর্গমূল রাখব, ওই জায়গাটাকে এখন বলব আমাদের বর্গমূলের জায়গা (ঘনমূলের ক্ষেত্রে বলব ঘনমূলের জায়গা)।

২। প্রথম গ্রুপে তাকাও— দেখো এর ভেতরে সর্বোচ্চ কোন সংখ্যার বর্গ যায়। ডান দিকে বর্গমূলের জায়গাটায় আমরা ওই সংখ্যাটা লিখব আর গ্রুপের তলায় সংখ্যাটার বর্গ লিখব। এখানে যেমন ১-এর ভেতরে

১-এর বর্গই যায়। ভাগের মতোই ওপরের সংখ্যাটা থেকে নিচের সংখ্যাটা বিয়োগ করে একটা দাগ দিয়ে নিচে বিয়োগফল লিখব। এরপাশে পরের গ্রুপটা নামাব। যেমন এখানে ১ থেকে ১ বাদ দিলে শূন্য হয়, সেটা আর লিখিনি আমি। এরপর পাশের গ্রুপ ৬৯ নামিয়েছি।

৩। বিয়োগফলের বাম দিকে ভাগের মতো একটা দাগ দিই। সেখানে বর্গমূলের জায়গায় যা আছে সেটার দ্বিগুণ লিখব এবং তার পাশে একঘর ফাঁকা জায়গা রাখব। এখানে বর্গমূলের জায়গায় ছিল ১। তাই আমি এর দ্বিগুণ ২ লিখেছি। ২-এর পাশে বাস্তুর মতো একটা জায়গা রেখেছি।

১ ৬৯ | ১  
১  
২০ | ৬৯

৪। এবার সবচেয়ে চিন্তার অংশ। ওই ফাঁকা জায়গায় এমন একটা অঙ্ক বসাতে হবে যেন তাকে দিয়ে পুরো সংখ্যাটা গুণ করলে সেটা ওই বিয়োগফল মানে এখানে ৬৯-এর ভেতরে যায়। একটা উদাহরণ দিলে ভালো করে বোঝা যাবে।

প্রথমে ভাবি ফাঁকা ঘরে ১ বসাব। তাহলে ২-এর পাশে ১ বসালে পাব ২১, এটাকে আবার ১ দিয়েই গুণ দিতে হবে। পাব  $21 \times 1 = 21$ , এটা ৬৯-এর চেয়ে ছোট। কিন্তু ১-এর চেয়ে বড় কিছু কি আর ৬৯-এর ভেতরে যায় না? দেখা যাক! ফাঁকা ঘরে ১, ২, এবং ৩ নিলে কী হবে সেটা আমি নিচের সারণিতে দেখাচ্ছি।

ফাঁকা ঘরে ১	ফাঁকা ঘরে ২	ফাঁকা ঘরে ৩
২১	২২	২৩
$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$
২১	৪৪	৬৯

বাহ, ফাঁকা ঘরে ৩ বসালে ৬৯ হয়ে যাচ্ছে, মিলে যাচ্ছে আমাদের বিয়োগফলের সাথে।

তার মানে ওই ফাঁকা ঘরে ৩ বসবে। এই ৩-কে বর্গমূলের জায়গাটায় ১-এর পাশে বসিয়ে দাও, পেয়ে যাবে পুরো সংখ্যাটার বর্গমূল। তার মানে ১৩ হচ্ছে আমাদের বর্গমূল। পাশের ছবিতে পুরো প্রক্রিয়া দেখে নাও।

১ ৬৯ | ১৩  
১  
২৩ | ৬৯  
 $\times 3$       ৬৯  
              ০

## আসল ঘটনাটা কী

ঘটনা আসলে কী সেটা বোঝার জন্য আমি নিচের সারণিতে দুইটা জিনিস দেখাচ্ছি: কেবল যে বর্গমূল করলাম, সেটা আর সেটার বীজগাণিতিক রূপ।

সংখ্যা রূপ	বীজগাণিতিক রূপ
$\frac{1}{1} \frac{6}{9}   13$	$\frac{100a^2 + 20ab + b^2}{10a + b}$
$\frac{1}{100a^2}$	
$\frac{2}{2} \frac{6}{9}   10 \times 2a + b$	$\frac{20ab + b^2}{20ab + b^2}$
$\frac{x}{x} \frac{6}{9}   0$	$0$

বীজগাণিতিক রূপটা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। আগেই বলেছিলাম আমাদের মূল সূত্র হলো  $(10a+b)^2=100a^2+20ab+b^2$ । খেয়াল করো, আমাদের উদাহরণে  $a=1$  আর  $b=3$ । এবারে  $10 \times 2a+b$  রাশিটার  $2a$ -এর দিকে তাকালে বোঝা যায় কেন বর্গমূলের জায়গায় যা আছে তার দ্বিগুণ নিতে হয়।  $10$  গুণ থাকার কারণে পাশে একটা জায়গা রাখি। এরপর এমন একটা  $b$  বের করতে হয়, যেন  $(10 \times 2a + b) \times b = 20ab + b^2$  পাওয়া যায়। আর আমরা যে দুই ঘর দুই ঘর করে গ্রুপ করেছিলাম, সেটা দেখা যায়  $100a^2$  রাশিটার দিকে তাকালে।  $100$  গুণ থাকার কারণে সেখানে দুইটা শূন্য থাকবেই, মানে এরপর দুইটা ঘর আসবেই।

একটা ব্যাপার, এখানে বর্গমূল ছিল  $13$ , দুই অঙ্কবিশিষ্ট। তাই  $a$ ,  $b$  বোঝাটা সহজ। কিন্তু যদি তার থেকে বেশি অঙ্কবিশিষ্ট হয়? ধরা যাক বর্গমূল  $521$ , যেটা তিন অঙ্কবিশিষ্ট, মানে মূল সংখ্যাটা হলো  $271881$ । তখন  $a$ ,  $b$  কী হবে? তখন  $521$ -কে আমরা  $10 \times 52 + 1$  আকারে ভাবতে পারব। মানে,  $a = 52$ ,  $b = 1$  ভাবা যাবে।

এই ছবিতে দেখলে ধারণা করতে পারবে। শুরুতে  $2718$ -এর জন্য চিন্তা করেছি। সেখানে,  $a=5$  আর  $b=2$  ধরেছি। ফলে  $5 \times 2 = 10$  রেখেছি বামপাশে। এরপর ফাঁকা ঘরে  $2$  নিয়ে  $102 \times 2 = 208$  পেয়েছি,

বিয়োগফল থেকেছে  $10$ । খেয়াল করো, যদি এই  $10$  অবশিষ্ট না থাকত, সংখ্যাটা যদি  $2718$  না হয়ে  $2708$  হতো, আমরা আসলে  $52$ -এর বর্গ পেতাম। কিন্তু আমাদের রয়ে গেছে  $10$ , এরপর পরের গ্রুপ  $81$ -কে নামিয়েছি। এবারে আমাদের ভাবতে হয়েছে  $a=52$  আর  $b=1$ ; তখন বাম দিকে নিয়েছি  $52$ -এর দ্বিগুণ  $108$ , তারপর ফাঁকা ঘরে  $1$  নিলেই মিলে গেছে  $1081 \times 1 = 1081$  হয়ে।

$27 18 81 | 521$

$25$

$\times 2 \quad 208$

$1081 | 1081$

$\times 1 \quad 0$

এ ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার বোঝা যাবে যদি সরাসরি  $52$ -এর বর্গ নিয়ে ভাবা যায়। সে ক্ষেত্রে,  $a=52$ ,  $a^2=2708$ ,  $2ab=108$ ,  $b^2=1$

## ঘনমূলের নিয়ম

আমরা অতীত থেকে শিক্ষা নিতে চাই। **হাতে-কলমে ঘনমূল নির্ণয়** বর্গমূলে যেহেতু  $(10a+b)^2$  নিয়ে ভেবেছি ঘনমূলে আমাদের ভাবতে হবে  $(10a+b)^3$  নিয়ে। আমাদের ভালো করে লক্ষ করতে হবে এ রাশিটার দিকে  $(10a+b)^3=1000a^3+300a^2b+30ab^2+b^3$

এখান থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব, ঘনমূল নির্ণয়ের বীজগাণিতিক রূপটা

ঘনমূলের বীজগাণিতিক রূপ
$\frac{1000a^3 + 300a^2b + 30ab^2 + b^3}{10a + b}$

$1000a^3$	$300a^2b + 30ab^2 + b^3$	$10a + b$
$1000a^3$		
$100 \times 3a^2 + 10 \times 3ab + b^2$	$300a^2b + 30ab^2 + b^3$	
$\times b$	$300a^2b + 30ab^2 + b^3$	
		$0$

ভালো করে খেয়াল করো বর্গমূলের নিয়মের সাথে পার্থক্যগুলো। তিনটি  $1000a^3$  থেকে বলা যায় এবারে আমাদের গ্রুপ বানাতে হবে তিনটি তিনটি করে। প্রথম গ্রুপের ভেতরে কোন সংখ্যার ঘন যায়, সেটা

অঙ্ক ভাইয়া • ১৪৯

দেখতে হবে, তারপর বিয়োগফল নিয়ে পরের গ্রন্থপটা নামাতে হবে। এরপরেই হলো আসল ঘটনা। আগে বর্গমূলের জায়গাটায় যা ছিল, শুধু সেটার দ্বিগুণ নিয়েছিলাম, তারপর একটা ফাঁকা ঘর রেখেছিলাম। এ ক্ষেত্রে ঘনমূলের জায়গাটায় যে আছে তার বর্গের তিন গুণ নিতে হবে ( $3a^2$ )। তারপর ‘দুই’ ঘর ফাঁকা রাখতে হবে, যেহেতু  $3a^2$ -এর সাথে ১০০ গুণ আছে।  $3ab$ -এর সাথে ১০ গুণ আছে, তাই সেটা থাকবে দশকের ঘরে। আর এককের ঘরে থাকবে  $b^2$ । কিন্তু সেই  $b^2$ টা কত হবে? এমন একটা এক অঙ্কের সংখ্যা  $b$  খুঁজে বের করতে হবে, যেন মাঝের ঘরে  $3ab$  আর শেষের ঘরে  $b^2$  রাখলে, পুরো যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে, তার সাথে  $b$  দিয়ে গুণ দিলে বিয়োগফলের ভেতরে যায়। আমি জানি, শুধু লেখাটা পড়ে এটা মোটেই বোঝা যাচ্ছে না।

একটা উদাহরণ দিয়ে দেখালে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে আশা করি। উদাহরণ বোঝা হয়ে গেলে ওপরের লেখাটা আরেকবার পড়ো। তখন বোঝাটা সহজ হবে।

**উদাহরণ : ১২১৬৭ সংখ্যাটির ঘনমূল কত?**

১। ডান থেকে শুরু করে তিনটি তিনটি করে ঘর নিয়ে ১২ ১৬৭/২  
 গ্রুপ বানাই। প্রতিটা গ্রুপের ওপরে একটা দাগ দিয়ে  
 চিহ্নিত করি। ৮  
 ৪ ১৬৭

২। প্রথম গ্রন্থে দেখি এর ভেতরে সর্বোচ্চ

কোন সংখ্যার ঘন যায়। এখানে ১২-এর মধ্যে  
যায়  $2^3=8$ । ঘনমূলের জায়গায় ২ লিখলাম।

১২-এর তলায় লিখলাম ২-এর ঘন ৮ বিষ্ণোগ ১২০০৪ ১৬৭

ଦିଲେ ହୁଯ ୪ । ଏରପର ପାଶେର ଗ୍ରହପ ୧୬୭  
ମାୟାଲାଭ ।

৩। বিয়োগফলের বাম দিকে ভাগের মতো একটা দাগ দিলাম। সেখানে ঘনমূলের জায়গায় যা আছে সেটার ‘বর্গের তিন গুণ’ ( $3a^2$ ) লিখি এবং তার পাশে দুই ঘর ফাঁকা জায়গা রাখি। এখানে ঘনমূলের জায়গায় ছিল ২। এটার বর্গ ৪, তার তিন গুণ হলো ১২। তাই ১২ লিখেছি এবং দুটো

ପାତ୍ରଜୀବିନୀ

৪। এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (এবং কামেলার) অংশ। ওই ফাঁকা জায়গা দুটোয় কী বসবে সেটা বের করতে হবে। এমন একটা অঙ্ক রাখলে, পুরো যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে, তার সাথে  $b$  দিয়ে গুণ দিলে বিয়োগফলের ভেতরে যায়। উদাহরণ দিলে ভালো করে বোকা যাবে। আমি  $b$ -এর মান ১, ২ আর ৩ হলে কীভাবে ফাঁকা ঘরগুলোতে হিসাব করতে হবে সেটা দেখাচ্ছি। খেয়াল রেখো এখানে  $a=2$  (ঘনমূলের জায়গায় যেটি রয়েছে)।

$b=1$ এর জন্য	$b=2$ এর জন্য	$b=3$ এর জন্য
$\begin{array}{c} 3ab \\ 3 \times 2 \times 1 \end{array}$ $\begin{array}{c} b^2 \\ 1^2 \end{array}$ $12 \underbrace{6 \quad 1}_{\text{}} \quad$ $12 \underbrace{12 \quad 4}_{\text{}}$ $\begin{array}{r} 1261 \\ \times 1 \\ \hline 1261 \end{array}$	$\begin{array}{c} 3ab \\ 3 \times 2 \times 2 \end{array}$ $\begin{array}{c} b^2 \\ 2^2 \end{array}$ $12 \underbrace{12 \quad 4}_{\text{}}$ $\begin{array}{r} 1324 \\ \times 2 \\ \hline 2648 \end{array}$	$\begin{array}{c} 3ab \\ 3 \times 2 \times 3 \end{array}$ $\begin{array}{c} b^2 \\ 3^2 \end{array}$ $12 \underbrace{18 \quad 9}_{\text{}}$ $\begin{array}{r} 1389 \\ \times 3 \\ \hline 4167 \end{array}$

বাহ, আমরা দেখতে পাচ্ছি ৩-এর জন্য মানটা মিলে যাচ্ছে ৪১৬৭-এর সাথে। আমরা যদি ৩-কে ঘনমূলের জায়গাটায় ২-এর পাশে বসিয়ে দিই, পেয়ে যাব পুরো সংখ্যাটার ঘনমূল। যেমন এখানে ২৩ হচ্ছে আমাদের ঘনমূল। পরো প্রক্রিয়াটা সংক্ষেপে নিচের ছবিতে দেখা যাবে

$$\begin{aligned}3a^2 &= 3 \times 2^2 = 12 \\3ab &= 3 \times 2 \times 3 = 18 \\b^2 &= 3^2 = 9\end{aligned}$$

12 18 9

1

1

$$f, 3ab=1b$$

১১-৩৮

三

## পট কোনো

খেয়াল করো,  $3ab=18$ -এর ৮ বাঞ্চে বসবে আর ১ হাতে থাকবে।  
সেটা সামনের ১২-এর সাথে মিলে ১৩ হবে। যদি এককের ঘরেও  
দুই অঙ্কবিশিষ্ট কোনো সংখ্যা আসত, সেখানেও একই কাজ করতে

হতো। যেমন  $b=4$  হলেই চলে আসত ১৬। তখন ৬-কে এককের  
ঘরে রেখে হাতের ১-কে আগের ঘরে মানে দশকের ঘরে যোগ করে  
পাঠিয়ে দিতাম।

আরেকটা ব্যাপার এখানে বলা উচিত।

$$\begin{array}{r} 12 \quad 1672 \\ \times \quad b \\ \hline 12 \quad 1672 \\ 12 \quad 167 \end{array}$$

আমাদের কি প্রতিবার  $b$ -এর মান ১ থেকে শুরু করে মিলিয়ে যেতে  
হবে? যতক্ষণ না মেলে? উত্তর হলো— না! একটু বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা  
করলেই হবে। খেয়াল করো, ঘনমূলের জ্যাগায় ২ লেখার পরে আমরা  
নিচে বাম দিকে লিখেছিলাম ১২, তারপর দুটো ঘর ফাঁকা রেখেছিলাম।  
তার মানে সেটা ছিল ১২০০। আর আমাদের বিয়োগফল ছিল ৪১৬৭,  
আপাতত ৪১০০ চিন্তা করো। শুনা দুটো (০০) বাদ দিয়েই ভাবতে  
পারো। ১২-এর সাথে কত গুণ দিলে ৪১-এর কাছাকাছি একটু কম মান  
পাওয়া যাবে?  $12 \times 2 = 24$ ,  $12 \times 3 = 36$ ,  $12 \times 4 = 48$ , তার মানে ৪  
হলে বেশি হয়ে যাবে। ৩ হতে পারে। এ জন্য  $b$ -এর মান সরাসরি ৩  
দিয়েই চেটো শুরু করতে পারো। সব হিসাবের পর শেষ উণ্ডফলটা যদি  
বিয়োগফলের চেয়ে বেশি হয়ে যেত তাহলে ৩-এর আগের সংখ্যা মানে  
২ দিয়ে চেটো করতাম।

নিয়ম এটুকুই। তবে আরও কয়েকটা উদাহরণ আমি করে দেখিয়ে  
দিচ্ছি। তাহলে যারা এখনো বিধায় আছে, তাদের উপকার হবে।

উদাহরণ ১: ৭৪০৮৮-এর ঘনমূল নির্ণয় করো

$$\begin{array}{l} 100 \times 3a^2 = 48 \\ 10 \times 3ab = 3 \times 4 \times 2 = 24 \\ b^2 = 2^2 = 4 \\ \hline 88 \quad 28 \quad 8 \\ \quad 68 \\ \hline 5088 \quad | 10 \quad 088 \\ \times 2 \quad | 10 \quad 088 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$78 \quad 088|82$$

উদাহরণ ২: ১৯০৬৬২৪-এর ঘনমূল নির্ণয় করো

$$\begin{array}{r} 3 \times 1^3 = 3 \\ 3 \times 1 \times 2 = 6 \\ 2^2 = 8 \\ \hline 1 \quad 906 \quad 624 \quad | 128 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \times 12^2 = 832 \\ 3 \times 12 \times 8 = 144 \\ 8^2 = 16 \\ \hline 83200 \\ 1440 \\ 16 \\ \hline 88656 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 368 \quad | 906 \\ \times 2 \quad | 928 \\ \hline 88656 \quad | 198 \quad 624 \\ \times 8 \quad | 198 \quad 624 \\ \hline 0 \end{array}$$

উদাহরণ ৩: ১৯০৬.৬২৪-এর ঘনমূল নির্ণয় করো

$$\begin{array}{r} 3 \times 1^3 = 3 \\ 3 \times 1 \times 2 = 6 \\ 2^2 = 8 \\ \hline 1 \quad 906. \quad 624 \quad | 12.8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \times 12^2 = 832 \\ 3 \times 12 \times 8 = 144 \\ 8^2 = 16 \\ \hline 83200 \\ 1440 \\ 16 \\ \hline 88656 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 368 \quad | 906 \\ \times 2 \quad | 928 \\ \hline 88656 \quad | 198 \quad 624 \\ \times 8 \quad | 198 \quad 624 \\ \hline 0 \end{array}$$

দশমিক থাকলে, দুটো ব্যাপার অতিরিক্ত ভাবতে হবে: গ্রুপ কীভাবে  
করতে হবে আর দশমিক কোথায় বসবে। গ্রুপের জন্য দশমিকের  
আগের আর পরের অংশ আলাদা করে ভাবতে হবে। দশমিকের  
আগের অঙ্কগুলো ওপরের আর সব সংখ্যার মতোই শেষ থেকে তিনটি

থেকে ওরা করে তান দিকে তিনটি তিনটি করে প্রস্তুত করে যেতে হবে।  
প্রয়োজনে শূন্য দিয়ে পূরণ করতে হবে। যেমন ১২৩৪৫.৬-কে প্রস্তুত  
প্রস্তুত করে লিখলে হবে ০১২ ৩৪৫. ৬০০। আর দশমিক কোথায় বসলে  
সেটা সাধারণ ভাগ অঙ্কের মাতোই। যখনই ওপর থেকে দশমিকের  
পরের কোনো প্রস্তুত নামবে, ঘনমূলের জায়গায় একটা দশমিক বসবে।  
নিচে দেখো, যেই না ৬২৪ নেমেছে, ওপরে ১২-এর পর একটা  
দশমিক বসিয়ে দিয়েছি। দশমিকসহ একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি এখানে।  
(এটা আসলে আগের উদাহরণটাই, যাকে শুধু একটা দশমিক বসিয়ে  
দিয়েছি)।

শেষ কথা : যারা ধৈর্য নিয়ে এ পর্যন্ত আসতে পেরেছ, অভিনন্দন। যদি  
সত্তিই বুঝে থাকো, তাহলে শুধু ঘনমূল না, n-তম মূল কীভাবে বের  
করতে হবে সেটারও একটা ধারণা পাওয়ার কথা তোমার (এখানে n  
হলো ১-এর চেয়ে বড় পূর্ণসংখ্যা)। চতুর্থমূলের জন্য যেই সম্পর্কটা  
ব্যবহার করতে হবে সেটা বলে দিই—

$$(10a+b)^4 = 10000a^4 + 4000a^3b + 600a^2b^2 + 40ab^3 + b^4$$

এখান থেকে  $1088576$  সংখ্যাটার চতুর্থমূল কি বের করে দেখাতে  
পারবে? যদি পারো, তাহলে বুঝব তুমি আসলেই পুরো প্রক্রিয়াটা  
বুঝেছ। সে ক্ষেত্রে পুরো হিসাবের ছবি তুলে আমাকে ইমেইলে পাঠিয়ে  
দিয়ো। আমি জানাব হয়েছে কি না! অনেকে দুবার বর্গমূল করেও  
চতুর্থমূল বের করে ফেলার চিন্তা করতে পারে, আমি সেটা চাচ্ছি না।  
আমি চাই এই বিস্তৃতি ব্যবহার করেই তোমরা বের করো। আর হ্যাঁ,  
শুধু উভয় লিখে দিয়ো না, শুধু উভয় দিলে বুঝব ক্যালকুলেটর চেপে  
বের করে ফেলেছ। চতুর্থমূল বের করতে যদি বেশি কষ্ট হয়, তাহলে  
নিজেরা ৬৮৯২১, ১৯৪৬৫১০৯ এদের ঘনমূল বের করো। তাহলেও  
ধারণাটা পাকাপোক্ত হবে।

## বিষয়-তালিকা

১. শুধু কী কাজে লাগে বলেই গণিত সুন্দর?	১৭
২. ১১=Onety one, 12=Onety two নয় কেন?	২৮
৩. 1th, 2th, 3th হলো না কেন?	২৬
৪. সাড়ে এক, সাড়ে দুই নাকি দেড়, আড়াই?	২৬
৫. পৃথিবীতে অঙ্গ কয়টা?	২৭
৬. ০ আবিষ্কারের আগে ১০, ২০ লিখত কীভাবে?	২৮
৭. বাংলাদেশের আয়তন নাকি ক্ষেত্রফল $1,87,570$ বর্গকিমি?	২৮
৮. বাংলাদেশের আয়তন কত ঘনকিমি?	৩০
৯. বর্গপুরুর ধাঁধা	৩৩
১০. সংখ্যার ওরা কোথায়?	৩৬
১১. অনেক অনেক বছর আগে জিনিসপাতির বয়স বের করত কিভাবে?	৩৬
১২. সুমার কি সুমেরুতে?	৩৮
১৩. ৬০ মিনিটে ১ ঘণ্টা, ১২ বছরে ১ যুগ। কেন ৬০, কেন ১২? কেন ২৫ বা ২৬ নয়?	৩৮
১৪. বৃত্ত কেন ৩৬০ ডিগ্রি?	৪০
১৫. শূন্য ধনাত্মক না কি অণ্ণাত্মক?	৪২
১৬. শূন্য জোড় না কি বিজোড়?	৪২
১৭. শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কেন ওই সংখ্যাটাই পাওয়া যায় না?	৪৩
১৮. শূন্য দিয়ে ভাগ করার আরেক সমস্যা	৪৪

১৯. ঘণাঞ্চক সংখ্যার কী দরকার ছিল?	৮৫	
২০. ঘণাঞ্চক সংখ্যার লসাঙ্গ-গসাঙ্গ কেমন হয়?	৮৬	
২১. একটা সংখ্যা শূন্য থাকলে লসাঙ্গ-গসাঙ্গ কেমন হয়?	৮৮	
২২. ০ আর ০-এর গসাঙ্গ ক্ষেত্রে বামেলা কোথায়?	৮৯	
২৩. লসাঙ্গের মূল ঘটনাটা কী?	৯০	
২৪. সহমৌলিক সংখ্যা কী?	৯২	
২৫. মৌলিক সংখ্যা কী?	৯২	
২৬. ১ কেন মৌলিক নয়?	৯২	
২৭. ফিবোনাচি সিরিজ কোথেকে এল?	৯৫	
২৮. ডায়োফেন্টাসের কবর	৯৭	
২৯. বীজগণিত আর পাটিগণিতের নাম রহস্য	৬০	
৩০. a, b, c, d না ধরে অজানা রাশি কেন x ধরে নিই?	৬০	
৩১. অত বীজগণিত শিখে লাভ কী?	৬২	
৩২. গণিতের একটি জাদু ও তার ব্যাখ্যা	৬৩	
৩৩. গণিতের আরেক জাদু এবং তার ব্যাখ্যা	৬৪	
৩৪. মনে মনে বর্গ করার উপায়	৬৫	
৩৫. বর্গমূল, ঘনমূল এবং যেকোনোতম মূল বের করার উপায়	৭০	
৩৬. লগ জিনিসটা আসলে কী?	৭১	
৩৭. বীজগণিতের সাতটা অপারেশন কী কী?	৭২	
৩৮. লগের ভেতর গুণ থাকলে বাইরে আলাদা করে যোগ হয় কেন?	৭৪	
৩৯. লগের ভেতর পাওয়ার থাকলে বাইরে বেরিয়ে আসে কেন?	৭৫	
৪০. লগ দিয়ে অঙ্কসংখ্যা বের করা	৭৬	
৪১. লগের আরেক ব্যবহার	৭৭	
৪২. লগের ভিত্তি কি ঘণাঞ্চক হতে পারে?	৭৭	
৪৩. ক্যালকুলেটর ছাড়া কি লগের মান বের করা যায়?	৭৮	
৪৪. ফাংশন দিয়ে কী হয়?	৮১	
৪৫. পরমমান তুললে প্লাস-মাইনাস লিখতে হয় কেন?	৮২	
৪৬. $\sqrt{4}$ =কত? +2, -2 নাকি $\pm 2$	৮৪	
		৮৫
৪৭. $\sqrt{x}$ প্রতীকটা কোথেকে এল?	৮৬	
৪৮. $f(x) = x^2$ কি এক-এক ফাংশন?	৮৬	
৪৯. কোডোমেন আর রেজেন পার্থক্য কী?	৮৭	
৫০. সার্বিক ফাংশন কী?	৮৭	
৫১. অসীম আর শূন্য কুণ্ডে শূন্য হয় না কেন?	৮৮	
৫২. লিমিট জিনিসটা কী?	৮৯	
৫৩. অনিশ্চয় আকার কোনওভাবে?	৯০	
৫৪. অসীম কি কোনো সংখ্যা?	৯২	
৫৫. অসমতার সমস্যা	৯৩	
৫৬. ‘বা’ কথন আর ‘এবং’ কথন?	৯৩	
৫৭. দেখতে সহজ, ভাবতে মজা সমস্যা	৯৪	
৫৮. অসমতায় ব্যন্তিকরণ করলে কি সব সমস্যা অসমতার চিহ্ন উল্লেখ যায়?	৯৫	
৫৯. চোখের ফেত্রফল	৯৬	
৬০. জ্যামিতির শুরু কোথায়?	৯৮	
৬১. বিন্দু কী জিনিস	১০০	
৬২. মোটা মার্কার, ০.৫ মিমি কলম নাকি সৃষ্টি পেনসিলে আঁকা বিন্দু?	১০০	
৬৩. বিন্দু, রেখা, বৃত্ত কি আসলে আঁকা যায়?	১০১	
৬৪. ছবি ‘আঁকি’ না ছবি ‘লিখি’?	১০১	
৬৫. x অক্ষকেই কেন স্বাধীন ধরা হয়?	১০২	
৬৬. পিথাগোরাসের উপপাদ্য কী কাজে লাগে	১০৩	
৬৭. নয় ভুজের ফেত্রফল কীভাবে বের করা যাবে?	১০৩	
৬৮. স্থানাঙ্কের দূরত্ব	১০৪	
৬৯. পিথাগোরাস দিয়ে আইনস্টাইনের সূত্র	১০৪	
৭০. পিথাগোরাস থেকে টুইন প্যারাডক্স	১০৫	
৭১. আয়ত, বর্গ, রম্বসে মিল-অমিল	১০৬	
৭২. $22/7$ কি পাই? $22/7$ -এর আনন্দটা কী রকম?	১০৭	
৭৩. পাইয়ের মান অতঘর জেনে লাভ কী?	১০৯	

৭৪. কোণের ক্ষেত্রে পাহয়ের মান  $180^{\circ}$  ডিগ্রি কী করে?

১১০

৭৫. রেডিয়ান কোণ কী?

১১০

৭৬. এক রেডিয়ান কোণ কি আদৌ পেনসিল-কম্পাসে  
আঁকা যায়?

১১১

৭৭. রেডিয়ান আসলে কী?

১১২

৭৮. গোলকের আয়তন ও পেরিয়াজকুচি পদ্ধতি

১১২

৭৯. গানের সাথে গণিতের সম্পর্ক কবে থেকে জানে মানুষ?

১১৮

৮০. বিজ্ঞান কী বলে, গান আসলে কী?

১১৯

৮১. সা-রে-গা-মা-র গণিত

১২০

৮২. এ মাইনর কর্ড কী জিনিস?

১২২

৮৩. সাইন, কস নামগুলো কোথেকে এল?

১২৮

৮৪. ত্রিকোণমিতি কোন কাজে লাগে?

১৩৩

৮৫. সাইন আর সাইন কি কাটাকাটি যায়?

১৩৪

৮৬.  $\sin 13^{\circ}$ ,  $\sin 71^{\circ}$  এমন যেকোনো কোণের মান কীভাবে  
পাওয়া যাবে?

১৩৫

৮৭. কাঞ্চনিক সংখ্যা কী?

১৩৬

৮৮. গণিতের সুন্দরতম সমীকরণ

১৩৭

৮৯. হাতে-কলমে ঘনমূল নির্ণয়

১৪৯

## বিশেষ কৃতজ্ঞতা

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার ফেসবুক পেজের বক্তৃ, ভক্ত ও  
শুভানুধ্যায়ীদের। কিছুকাল আগে (আগস্ট ১২, ২০১৭) ফেসবুকে  
'কমেন্টে কমেন্টে গণিত' নামে একটি পোষ্ট দেওয়ার পর সেখানে  
অনেক মানুষ প্রশ্ন করেছিল। অনেকের প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি,  
ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। এ  
বইটির ধারণা তখনই মাথায় আসে। এ বইটিতে একটা বিরাট অবদান  
তাদের, যারা প্রশ্ন দিয়ে সমৃক্ষ করেছেন বইটিকে। নিচে বর্ণানুক্রমে  
তাদের ফেসবুক প্রোফাইল নামের তালিকা দেওয়া হলো—

খায়রুল বিন আমিন

Gmh Khwarezmi Al Musa

সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ

Hafizur Rahman Shakil

Abu Royhan Sopno

Imran Hasan Bayejid

Adib Nashid

Indranil Swakshar Sarkar

Adrij Bachchan

Ishtiaque Shilpo

Afridi Rahim

Jashim Uddin

Ahamed Asief

Kamrul Hasan Tuhin

Azmal Karim Sirat

Kawsar Mahmud

Diganto Mojumder

Khadizatul Kubra Sara

Ekramul Hoque

M Kawsar Hossen

Farhan Rabby

Mamunur Rashid Don

Fayaz Masnun Labib

Md Imtiajul Karim

Md Kamal Hossain	Rokunuzzaman Tuash
Md Mehedi Hasan	Rubaiya Haque Ruba
MD Naeem Haider	Sabab Iqbal
MD Sabbir Ahmed	Sabila Nawshin
Naima Binte Azad	Sadman Shuvo
Nayem Sheikh	Sakibul Hoque
Nazim Uddin Saimum	Sakibul Munna
Neel Sagar	Sakibul Munna
Nusrat Tushu	Sanjida Bokul
Parves Khan	Shahid Bin Siraz
PM Anawarul Iqbal	Shahriar Rahman Siam,
Pothik Roy	Shahriyar Mohammad Siyar
Pran Krishno Das	Shahrukh Islam
Rajib Hossain	Sheikh Monir Ahmed
Rakib Hasan Sidor	Tamanna Jahan Tonni
Rakibul Haydar Rakib	Tania Jannat
Rashed Khan	Tanjim Azad Chowdhury
Rifat Vectra RX	Tanzin Tisha
Robinhood Chowdhury	Tawhid Shajad

Md Kamal Hossain	Rokunuzzaman Tuash
Md Mehedi Hasan	Rubaiya Haque Ruba
MD Naeem Haider	Sabab Iqbal
MD Sabbir Ahmed	Sabila Nawshin
Naima Binte Azad	Sadman Shuvo
Nayem Sheikh	Sakibul Hoque
Nazim Uddin Saimum	Sakibul Munna
Neel Sagar	Sakibul Munna
Nusrat Tushu	Sanjida Bokul
Parves Khan	Shahid Bin Siraz
PM Anawarul Iqbal	Shahriar Rahman Siam,
Pothik Roy	Shahriyar Mohammad Siyam
Pran Krishno Das	Shahrukh Islam
Rajib Hossain	Sheikh Monir Ahmed
Rakib Hasan Sidor	Tamanna Jahan Tonni
Rakibul Haydar Rakib	Tania Jannat
Rashed Khan	Tanjim Azad Chowdhury
Rifat Vectra RX	Tanzin Tisha
Robinhood Chowdhury	Tawhid Shajad





চমক হাসানের জন্ম ২৮ জুলাই, ১৯৮৬, কুষ্টিয়ায়। বাবা আহসানুল হক, মা নওরাজিস আরা জাহান। এইচএসসি পর্যাপ্ত লেখাপড়া কুষ্টিয়াতেই। এরপর বুয়েট থেকে তড়িৎকৌশলে স্নাতক এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ক্যারোলাইনা থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। বর্তমানে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছেন 'বোষ্টন সায়েন্টিফিক কর্পোরেশন'-এ। স্ত্রী ফিরোজা বহু এবং কন্যা বিনীতা বর্ণমালার সঙ্গে থাকেন ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা ক্লারিটা শহরে।

তার ভালো লাগে গাইতে, পড়তে, শিখতে, শেখাতে। চমক হাসান আশাবাদী মানুষ, স্বপ্ন দেখেন আলোকিত ভবিষ্যতের, যখন এ দেশের ছেলেমেয়েরা আনন্দ নিয়ে লেখাপড়া করবে, প্রশ্ন করতে ভয় পাবে না, মুখস্থ করে পাস করবে না। ওরা অনুভব করবে কেন, কীভাবে, কী হচ্ছে! গণিত অলিম্পিয়াড শুরুর সাথে সাথে এই আন্দোলনটাও শুরু হয়ে গেছে। তিনি সেই আন্দোলনের একজন কর্মী। গণিত অলিম্পিয়াডের একাডেমিক দলে প্রশিক্ষক, প্রশ্নপ্রদাতা ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করেছেন বেশ কিছুদিন। পাঠকের যেকোনো মন্তব্য তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন্তব্য জানাতে পারেন ই-মেইলে কিংবা ফেসবুকে তার অফিশিয়াল পেজে।

ই-মেইল : chondrochari@gmail.com

ফেসবুক পেজ : www.facebook.com/chamok.hasan



MATHEMATICS 2018



**ADARSHA**

+88-02-9612877, +88-01793296202  
[info@adarshapublications.com](mailto:info@adarshapublications.com)  
[www.adarshapublications.com](http://www.adarshapublications.com)

